রাম
রহিম

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মানুষের, মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু আজ দৈনন্দিন অতিবাস্তব ঘটনা মাত্র। কিন্তু মানুষের ইতিহাস স্থাবর নয়, অপমৃত্যুই জীবনের চরম সত্য নয়—দিন বদলায়, দিন বদলাচ্ছে। এই দিন-বদলের আলো-অন্ধকারের চিত্রই এই বইয়ে সংকলিত গল্পগুলির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি।

গল্পগুলি আগে 'পূর্বাশা', 'নতুন সাহিত্য', 'অভ্যুদয়', 'মনের মতোন কাগজ', 'অভিবাদন' ও 'শারদীয় গণবার্তা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সব পত্রিকার সম্পাদকদের এই সুযোগে ধন্যবাদ। বইটির প্রকাশ-ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেছেন বেঙ্গল পাবলিশার্সে'র শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তরুণ লেখকবন্ধু শচীন ভৌমিক, মিহির সেন ও ক্ষিতীশ সরকার। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

১লা আষাঢ়, ১৩৫৯

এই লেখকের

অন্যান্য বই

কবিতা

চন্দ্র-সূর্য

গল্প

রাত্রির আকাশে সূর্য (২য় সং)

উপন্যাস

জীবন-যৌবন (যন্ত্রস্থ)

অনূদিত

উপন্যাস

ভূতগ্রস্ত

অন্তর্জালা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
রমাপদ চৌধুরী

বন্ধুত্রয়েষু

'আর না, এবার চল। শুনছ—'

প্রিয়নাথ কথা বলে না, শুধু একবার ফিরে তাকায়। তারপর একে ডিঙিয়ে ওকে পাশ কাটিয়ে এগোতে থাকে। তার আগে স্বেচ্ছাসেবক, পিছনে কনক।

'আপনি কোত্থেকে আসছেন ?'

মেয়েটি অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল, আচমকা প্রশ্নে থতমত খেয়ে যায়।

প্রিয়নাথ ফের জিজ্ঞেস করে, 'কোত্থেকে আসছেন আপনি ?'

মেয়েটি মাথায় কাপড় তুলে দেয়, হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

'স্বামীটামী কেউ নেই সঙ্গে—কি গো ?'

মেয়েটি স্বেচ্ছাসেবকের দিকে চোখ তুলে ঘাড় নেড়ে জানায় আছে। মুখ বাড়িয়ে সামনের কলটা দেখিয়ে দেয়, অর্থাৎ ওই কলেই গেছে তার স্বামী।

'স্বামী ছাড়া আর কেউ ? নেই ? তা, কোত্থেকে আপনারা আসছেন ?'

'ছাটিগাঁ।'

'অ !' হতাশায় প্রিয়নাথ সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

'এগেইন ফেলিওর !' কনকের দিকে তাকিয়ে স্বেচ্ছাসেবক মুখ টিপে হাসে। ঠোঁট উল্টিয়ে হাসিটা হতাশাব্যঞ্জক করে তুলতে চায়।

'আমার কি মনে হয় জানো,' খানিক ইতস্তত করে কনক বলে,

তুমি হয়ত ভুল শুনেছ। নইলে, মানে, খোঁজ তো আর কম করা হল না—'

'তা যা বলেছেন।' কনকের চোখে চোখ রেখে তালে তালে মাথা নাড়ে স্বেচ্ছাসেবক, 'কমসেকম ঘণ্টাখানেক ধরে তো—'

প্রিয়নাথ বাধা দেয়, 'উঁহু, মিথ্যে কথা বলার লোকই না নারান বাবু। স্বচক্ষে তিনি জ্যাঠাইমাকে দেখেছেন, কমলা বিনি ছোট খুকি ওরাও ছিল। কেমন, বলেননি?'

'তা বলেছেন।' সঙ্গে সঙ্গে কনক সায় দিয়ে বসে।—'কিন্তু'-কথা অসমাপ্ত রেখে চারপাশে তাকায়।

ব্লিচিং পাউডার ডিডিটি-র উগ্র ঝাঁঝাল গন্ধে সারা শরীর এখন গুলোতে শুরু করেছে। ভীমরুলের চাক ভাঙার মত একটানা গুঞ্জনধ্বনিতে ঝিমঝিম করছে মাথা। দম-আটকানো ভ্যাপসা গরমে নিশ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। পেটের মধ্যে পাক দিয়ে দিয়ে ঠেলে উঠছে বমির বেগ। অথচ গলায় আঙুল দিলেও বমি হবে না এমনই নোংরা পরিবেশ। এইমাত্র একটা ট্রেণ এসে ইন করল, গমগম করে ওঠে সারা প্লাটফর্ম। এঞ্জিনের হাঁসফাঁস কুলিদের হাঁকডাক যাত্রীদের হইহল্লা—কি যে এক অকথ্য অস্বস্তি জাগে কনকের! কাতর চোখে সে প্রিয়নাথের দিকে তাকায়, কাতর কণ্ঠে বলে, 'আর কত ঘুরবে? আমার ভালো লাগছে না। চলো—'

কনকের কথা যেন প্রিয়নাথের কানেই যায় না, চারপাশে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে সে পা বাড়ায় গুটিগুটি।

প্রিয়নাথের হয়ে জবাব দেয় স্বেচ্ছাসেবক, 'তাই যদি বলেন,

এইখেনেই আছে হাজার সাতেক, নর্থে হাজার দুই, সাউথে—'

'এত?'

'বাঃ, হবে না! তবু তো আসার দিনতিনেকের মধ্যেই এখেন থেকে ক্যাম্পে পাঠ্যে দেয়। নইলে—'

প্রিয়নাথ বলে, 'তাই তো তাড়াতাড়ি করছি। পরশু এসেছেন, আজ যদি খুঁজে বের করতে না পারি—'গলার স্বর তার ভারী হয়ে আসে, 'তুমি তো জানো কী রকম জেদ জ্যাঠাইমার! ক্যাম্পে গিয়ে সবশুদ্ধু না খেয়ে মরবেন, তবু—'

'তা অবিশ্যি ঠিক।'

সত্যি বড় জেদী মানুষ কনকের খুড়শাশুড়ী। বিশেষ করে সেই ঝগড়াঝাটির পর থেকে—স্বেচ্ছাসেবকটিকে লক্ষ্য করেই কনক কথা শুরু করেছিল, কিন্তু তার মুগ্ধ দুই চোখের দৃষ্টি দেখে হঠাৎ চুপ করে গেল। তাকে দেখছে না তার কথা শুনছে ছেলেটা? দেখুক, তাকেই তাহলে দেখুক, কথা বলে কি লাভ তবে? কথা বলতে কনকের আর ভালোও লাগছে না।

আবার প্রিয়নাথের গা ঘেঁষে আসে কনক।

'শুনছ—এ্যাই—'

প্রিয়নাথ কান দিলে তো!

চার-বাই-তিন কি দু-বাই-দু হাত জায়গা পড়েছে একেকজনের ভাগ্যে। ছেঁড়া চট কম্বল মাদুর বা চ্যাটাই বিছিয়ে বাক্স-প্যাঁটরা গাঁটড়াগাঁটড়ি হাঁড়িকুড়ি নিয়ে তারই মধ্যে মাথা গুঁজেছে

একেকটি আস্ত সংসার। মনে হয়, গোটাকয়েক গরীবগুর্বো গ্রামকে উপড়ে এনে আছড়ে ফেলা হয়েছে প্লাটফর্মটার ওপর। কিন্তু বাঁচবার আশাটা বেপরোয়া বলেই মরা-হাজা মানুষগুলি এখানেই ফের নতুন করে সংসার পেতে বসেছে। ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি সংসার—এরই মাঝখান দিয়ে পায়ে চলার পথ আছে বিঘৎখানেক কোথাও বা হাতটাক চওড়া। তাও আবার জলে কাদায় থুতুতে কফে ছোটদের গুয়ে-মুতে থকথকে।

প্রত্যেকবার পা বাড়ায় আর কনক ভাবে, ফিরে যাবার কথাটা ফের একবার বলবে নাকি প্রিয়নাথকে?

'আচ্ছা, আপনার জ্যাঠাইমার সঙ্গে কে কে আছে, আরেকবার বলুন দিকি দাদা?'

'বিধবা জ্যাঠাইমা, তাঁর তিন মেয়ে, এক ছেলে—'

'কোন ইয়াং লেডী? মানে ছুঁ—ইয়ে, যুবতী? সাউথে এক গিরিবালা দেবী আছে, তার দুটো ইয়াং যুবতী ডটারকে—'

কনক চমকে ওঠে, 'বলেন কি, দুই মেয়েকেই—?'

'ও সালার নেড়েদের কথা বাদ দিন, বলে, বুড়িটাকে ছেড়ে দিয়েছে এই ভাগ্যি! ইস্, একবার যদি সালাদের হাতের কাছে পেতুম!' ঘাড়-ছাঁটা মাথায় গেরুয়া টুপিটা টেনে টেনে বসায় স্বেচ্ছা-সেবকটি, আস্ফালন করে আড়চোখে কনকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

প্রিয়নাথ প্রতিবাদ জানায়, 'না না—ওই গিরিবালা দেবী আমার জ্যাঠাইমা না। আসলে আমাদের ওখানে কোন গোলমাল হয়নি, ওঁরা আতঙ্কে চলে এসেছেন। তাছাড়া নারানবাবুও কাল

বললেন না কমলা আর বিনিকেও তিনি দেখেছেন—হ্যাগা ?'

কনক ঘাড় কাৎ করে।

'আসল কথাটা কি জানেন', অন্তরঙ্গ সুরে প্রিয়নাথ বলে, 'সাংসারিক কারণে জ্যাঠাইমার সাথে আমাদের বনিবনা নেই, তাই ইচ্ছে করেই তিনি আমার ওখানে ওঠেননি। কিন্তু আমি কি তাই বলে এই দুঃসময়ে বসে থাকতে পারি? আপনিই বলুন ভাই, পারি? তবু তো আমি একটু ইয়ে করেছিলুম. কিন্তু উনি—'কনককে সে দেখিয়ে দেয়।

ম্লান হাসি কনকের মুখে ফুটে ওঠে।

'উনি ঠিক করেছেন, ঠিক, ঠিক' 'লেডী লাইক ওয়ার্ক করেছেন।' কনকের দিকে তাকিয়ে স্বেচ্ছাসেবকটি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, 'হিন্দু হয়েও এসময়ে যে হাত গুটিয়ে থাকে, সে সা—ইয়ে, হিন্দুই না। জানেন দাদা, আমাদের বাড়িই একটা হোটেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু হোটেল? হোটেল এ্যাণ্ড হসপিটাল। আমাদেরও, মানে, আমার মা'র মামাবাড়ি ইস্টবেঙ্গলে কিনা!'

হঠাৎ কনককে দাঁড়াতে হয়। শুধু দাঁড়াতে নয়, দু'পা পিছোতেও। বিঘৎখানেক পথের উপরেই হড় হড় করে বমি করছে বছর পাঁচেকের একটি ছেলে। রোগা হ্যাংলা বছর কুড়ি-বাইশের একটি বউ ছেলেটিকে কোলে করে বসে। কিন্তু এমনই আথালি-পাথালি করছে ছেলেটা যে তাল সামলাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে দুর্বলদেহ মা'টি। এক হাতে সে ছেলে সামলায় আরেক হাতে কাঁথা-বালিশ, আর থেকে থেকে অসহায় চোখ তুলে তাকায় চারপাশ।

'আহাহা! ধরো ধরো।' প্রিয়নাথ পিছন থেকে চেপে বসিয়ে দিল কনককে।

প্রিয়নাথ বসিয়ে না দিলেও বসত কনক। শাড়ির আঁচল সে আগেই গুটিয়ে নিয়েছিল।

দেড় ঘণ্টার ভেদ-বমিতে মরে গেছে যার একমাত্র সন্তান, সে কি পারে নাকি এই দৃশ্য চোখে দেখেও পাশ কাটিয়ে চলে যেতে?

বৌটির পাশে উবু হয়ে কনক বসে। বলে, 'দাও ভাই দাও, আমি ধরছি খোকনকে। তুমি বরং বিছানাটা ঠিক করে নাও।' ছেলেটিকে টেনে নিয়ে কোলের সামনে বসায়, বগলের তলায় হাত দিয়ে জাপ্টে ধরে। ধরে ভয়ে ভয়ে, তার কোমল হাতের চাপ লেগেই না ভেঙে যায় পাঁচ বছর বয়েসের বুকের পাঁজরগুলি!

'ডাক্তার, একজন ডাক্তার পাওয়া যায় না?'

'নিশ্চই নিশ্চই। দাঁড়ান নিয়াসি', বলে ভিড়ের মধ্যেও আশ্চর্য কৌশলে চকিতে অদৃশ্য হয়ে যায় স্বেচ্ছাসেবক।

'আহাহা! আপনার ছেলে বুঝি?'

বউটি চোখ তোলে। তাকায় ফ্যালফ্যাল করে।

প্রিয়নাথ ফের বলে, 'বাড়ি কোথায়?'

'ঝালকাঠি।'

'এই এক ছেলে? আর?'

বউটি জবাব দেয় না, নিজের ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'সঙ্গে কে আছেন? স্বামী? বা—'

প্রিয়নাথ নয়, বউটি এবার কনকের দিকে তাকায়—থরথর করে কাঁপছে তার দুই ঠোঁট। চাপা ফোঁপানির সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা

তার পাক দিয়ে ওঠে, চোখ উথলে আসে, তারপর হঠাৎ দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে থাকে।

আর কনক দেখে—সোনাবাঁধান শাঁখাটা এখনো হাতে আছে, কিন্তু খাঁ খাঁ করছে রুক্ষ শাদা সিঁথি!

'আহা-হা! এই হ্যাঙ্গামাতেই বুঝি।'

বৌটি জবাব দেয় না মুখও তোলে না, কাঁদে শুধু এক নাগারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

অসহ্য বিরক্তিতে মন ভরে যায় কনকের। একি মাত্রছাড়ান কৌতূহল প্রিয়নাথের? এতই অবুঝ নাকি মানুষটা? দেখে-শুনেও কিছু বোঝে না এমনই নাকি বোকা? স্থানকালপাত্রভেদ নেই! ছি ছি!

বৌটির পিঠে হাত রাখে কনক।—'শুনছ, ও ভাই, শুনছ'

বৌটি শোনে না, আরও বেশী করে ঝুঁকে পড়ে। কাপড়ের দলা মুখে পুরে দিয়ে আরও বেশী করে ফোঁপায়।

চারপাশ থেকে চেয়ে আছে সকলে। চেয়েই শুধু আছে, দৃষ্টি নির্বিকার। বৌটির ঠিক পাশেই কাঁথায় মুড়ি ছড়িয়ে স্বামী স্ত্রী তিনটি কাচ্চাবাচ্চা গোগ্রাসে মুড়ি চিবুচ্ছিল। মাছি ভনভন করছে, এক হাতে মাছি তাড়াতে তাড়াতে তারা চিবিয়েই যায় মুড়ি। কচি ছেলেটা বুঝি এক সঙ্গে দুহাতে দুমুঠো মুড়ি তুলেছিল, কিন্তু তুললেও দুটি মুঠো যে এক সঙ্গে মুখে পোরা সম্ভব নয় তা বোঝে না তার বাপ। ঠাস করে সে এক চড় কষিয়ে দেয় ছেলের গালে—'হারামজাদা, একাই তুমি হগ্‌গলটি খাইতে চাও! রাইক্ষস!'

শিউরে ওঠে কনক, চড়টা যেন সরাসরি তার গালেই এসে পড়েছে! কিন্তু ছাখ, কী নির্বিকার মা ছেলেটির! ছেলে কাঁদছে কাঁদুক. ছেলের দিকে তাকাবার এখন ফুরসৎ নেই তার। ভাগের মুড়ি শেষ হবার আগে বাপের চড়ে ছেলে মরে গেলেও ফুরসৎ বুঝি হবেও না।

'একি, একেবারে কোলে করে বসেছেন যে! কাপড়ে বমিটমি—' কনকের। হুঁশ হয়। সত্যি, কখন যে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়েছে, তার বুকের ওপর নেতিয়ে পড়েছে বাচ্চাটা, খেয়াল নেই। স্বেচ্ছাসেবকের কথায় সে একটু নড়ে চড়ে বসে কিন্তু বাচ্চাকে নামায় না।

'ডাক্তার?'

'ডাক্তার মাত্র একজন আছেন, আসতে পারবেন না—ওখানে নিয়ে যেতে হবে।' ব'লে বছর পনের ষোলর এক কিশোরী স্বেচ্ছাসেবিকা এগিয়ে আসে।—'দিন দিদি, ওকে আমার কোলে দিন।'

ছ'হাঁটুতে মুখ গুঁজেই বৌটি চোখ তুলে তাকাচ্ছিল. হঠাৎ সোজা হয়ে বসল, 'না না দিমুনা, অরে আমি লইয়া যাইতে দিমুনা—ছান, আমার পোলা আমারে ফিরাইয়া ছান।'

'অসুখ হয়েছে যে ভাই, ডাক্তার না দেখালে—'

বৌটি কেবলই বলে—না না। কনক যত বোঝায় ততই সে সে গলা ছাড়ে। ছেলে যদি মরে, তার কোলের উপরেই মরুক, মরা ছেলেকে কোলে নিয়ে সেও শেষকালে মরবে। মরার বাড়া তো আর কিছু নেই। তাই বলে ছেলেকে সে

কোল ছাড়া করবে না, করতে পারবে না—বিশ্বাস সে কাউকে করে না, কাউকে না। কাউকেই না!

'আঃ কি হচ্ছে! ও যদি না চায়—'

প্রিয়নাথের বিরক্তি টের পায়, তবু তার কথা কনক কানে তোলে না। বউটিকে বলে, 'বেশ তো ভাই, তুমিও তাহলে সঙ্গে এসো। তুমি মা, মা'র কি এত অবুঝ হলে চলে।'

'না অবুঝ হইব না!' বৌটি ফুঁপিয়ে ওঠে।

স্বেচ্ছাসেবিকা আবার বলে, 'দিন দিদি, ওকে আমার কোলে দিন।'

'চল না, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।'

'না না, সে কি হয়! আমি যে ভলান্টিয়ার।'

মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে কনক বলে, 'বেশত, কাজের তো অভাব নেই, আর তোমারও তো আছেই—'

ম্লান হয়ে যায় কিশোরী মেয়েটির মুখ, ম্লান স্বরে বলে, 'আমার বয়েস কম কিনা, তাই মীরাদি সুবোধদা ওঁরা আমায় কোন কাজ করতে দেন না। কিন্তু জানেন, আমি খুব ভালো নার্সিং করতে পারি, বাড়িতে সেদিন দাদুর অসুখ হয়েছিল, আমি এ-কা নার্সিং করেছিলাম। ইশকুলে—'

'কিইযে করছ!' এবার খানিকটা ধমকের সুরে প্রিয়নাথ বলে, 'ভলান্টিয়ার থাকতে তুমি কেন হাঙ্গামা পোয়াচ্ছ? দিয়ে দাও। এখনো সাউথটা দেখতে হবে।'

প্রিয়নাথের কথা যেন শুনতে পায়নি, পেলেও বুঝতে পারেনি কনক, স্বেচ্ছাসেবিকাকে বলে, 'তুমি বরং এর মা'কে ধরে নিয়ে

চল, ও ও অসুস্থ—দেখছ তো—' চোখের ইশারায় যে কথাটি সে বলতে যাচ্ছিল তা আর বলে না। শুধু চোখের ইশারায় সে-কথার মানে শিশু-সরল এই কিশোরী বুঝবে কি!

বৌটি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। নোংরা ছেঁড়া বমিতে মাখামাখি শাড়িখানা দিয়ে কোনমতে সে শরীরটাকে ঢেকে নেয়। আর শাদা ধবধবে শাড়ি ব্লাউজ পরা এক স্বেচ্ছাসেবিকা পাশ থেকে তার কোমর জড়িয়ে ধরে।

হাঁটতে গিয়ে টলে ওঠে বৌটি, স্বেচ্ছাসেবিকা বলে, 'আমাকে ধরুন, বেশ ভালো করে জড়িয়ে ধরুন—দেখুন আমি ঠি-ক নিয়ে যাব।'

হঠাৎ কেন যেন বড় বেশী ছটফটে ঠ্যাখায় স্বেচ্ছাসেবককে। কয়েক পা গিয়ে প্রিয়নাথকে সে বলে, 'তা'লে দাদা আসি আমি, এবার চলি—ওদিকে এক সালা আনসার ধরা পড়েছে—'

'আনসার!'

'নেড়ে মাত্রেই আনসার? হ্যাঁ, চলি।' চাঁদার কৌটাটি সে কোলের সামনে ঝনঝন শব্দে নাড়াতে থাকে। খানিক ইতস্তত করে বলে, 'দেবেন নাকি দাদা? আপনাদের হেল্প ছাড়া—'

বিনা বাক্যব্যয়ে একটা আধুলি বের করে প্রিয়নাথ কৌটায় গুঁজে দেয়। অনেকক্ষণ ধরে আটকে রেখেছে ছোকরাকে, চাঁদা না দিক, মজুরীটা অন্তত দেয়া উচিত।

'আচ্ছা দিদি—ইয়ে বৌদি, নমসকার,' একগাল হেসে গেরুয়া টুপিটা ঠিক করতে করতে বিদায় নেয় স্বেচ্ছাসেবক।

'আনসার ?' অবাক স্বরে প্রশ্ন করে কনক, 'আনসার কাকে বলে ?'

প্রিয়নাথ বুঝিয়ে দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই জবাব দেয় স্বেচ্ছাসেবিকা, 'বাজে কথা দিদি—আনসার-টানসার একেবারে বাজে কথা !—একদল বদমাস জুটেছে, ভলান্টিয়ার সেজে থাকে আর যা-তা কাণ্ড করে। মুসলমান দেখলেই আনসার বলে মারতে শুরু করে। কাল একজন হিন্দুকেই তো'—আচমকা সে কথা অসমাপ্ত রেখে প্রিয়নাথকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি ওকে চাঁদা দিলেন কেন ? জানেন ওদের কীর্তি ?'

অমায়িক হাসিতে কথাটা উড়িয়ে দেয় প্রিয়নাথ।

গোটা তিনেক টেবিল, তুটি বেঞ্চ একটি চেয়ার। বেঞ্চ তুটির উপরে জন পনেরো রোগী বসে কাৎ হয়ে ধুঁকছে, গোঙাচ্ছে। টেবিলগুলি জোড়া দিয়ে ওষুধের শিশি বোতল রাখার তাক করা হয়েছে। চেয়ারটি বোধ হয় ডাক্তারের জন্যে। কিন্তু চেয়ারে বসে সোয়াস্তি নেই ডাক্তারের। একবার তিনি এর বুক দেখেন আবার ওর নাড়ি টেপেন, পরক্ষণেই যান টেবিলের কাছে—প্রেসক্রুপসন লেখার অবসর নেই—মুখে মুখে নির্দেশ দেন ওষুধের। ছোটখাট একটি হাসপাতাল গড়ে উঠেছে প্লাটফর্মের এই কিনারটিতে।

মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকেই নিজেকে অনেক দিনের রোগী বলে মনে হয় কনকের। মাথা ঘুরতে থাকে, চোখ জ্বালা জ্বালা করে, অকথ্য বিষাদে মন ভরে ওঠে—সাথে সাথে মুখের থুতু পর্যন্ত বিস্বাদ ঠেকে।

দেখে শুনে ডাক্তার ঠোঁট ওল্টালেন।

ব্যাকুলভাবে কনক বলে, 'হাসপাতালে পাঠান যায় না ভাই।' একেবারে ডাক্তারের গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, হঠাৎ প্যাণ্টের পকেটে দুই হাত না পুরে ফেললে তার হাত দুটিই বোধ হয় সে জড়িয়ে ধরত। 'কিছু টাকা না হয় দেব— দেখুন না ডাক্তারবাবু।'

তেমনি ঠোঁট উল্টিয়েই ডাক্তার বলেন, 'হাসপাতাল। কিন্তু লাভ কি? প্রথমে বারান্দায় ফেলে রাখবে, তারপর দিয়ে দেবে ডোমকে।

'আঁ!'

'অবাক হচ্ছেন! ওই ছেলেটিকে দেখুন, কাল হাসপাতালে, পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ দিয়েছে— সিট নেই। আমি ডাক্তার, ওই দেখুন আমার চোখের সামনে তিলে তিলে রোগী মরছে— কিন্তু আমি আমি—'হঠাৎ কথা থামিয়ে একটু কেসে নিয়ে ডাক্তার পিছন ফেরেন। জনতিনেক ছেলে ওষুধ তৈরী করছিল, তাদের পাশে এগিয়ে যান।

একহাত চওড়া বেঞ্চের ওপরেই চিৎ হয়ে পড়ে আছে বছর সাতেকের একটি ছেলে। টকটকে রঙ, একমাথা কোঁকড়ান চুল, পরণে দামী কাপড়ের প্যাণ্ট হাফশার্ট। মাথায় বালিশ নেই, বগলের পাশে একটি লাল মোটরকার, খেলনার মোটরকার।

মরে গেছে? না না, মরে যাচ্ছে!

কে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে কি বলছেঃ কেন

মরবে না? কেন বেচে থাকবে দেবশিশুর মত সুন্দর এই ছেলেটি নরকের মত কুৎসিৎ জঘণ্য এই পৃথিবীতে? ঢাকার কোন বিখ্যাত ডাক্তারের নাতি, বড়লোক ইঞ্জিনীয়ারের একমাত্র সন্তান। কিন্তু হিন্দু তো? তাই সমস্ত পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে। শুধু রাত্রির অন্ধকারে এই ছেলেটিকে বুকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল ডাক্তারের অতি পুরাতন কম্পাউণ্ডার। বৃদ্ধ বিশ্বস্ত কম্পাউণ্ডার। কিন্তু মুসলমান তো সে? ছেলেটিকে সে হিন্দুস্থানে পৌছে দিয়েছে ঠিক, কিন্তু তাই বলে তার স্বধর্মীদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না তাকে?

প্রকাশ্য প্লাটফর্মের ওপর এই ছেলেটির চোখের সামনেই খুন হয়ে গিয়ে করতে হবে না প্রায়শ্চিত্ত? ভগবান আছেন না?

ভগবান! দম বন্ধ হয়ে আসছে কনকের। বিভ্রান্তভাবে সে এপাশ ওপাশ তাকায়। কোথায় প্রিয়নাথ? অত দূরে কেন দাঁড়িয়ে আছে প্রিয়নাথ? কি এখনো দেখছে প্রিয়নাথ কলের পাশে ভিড় করে দাঁড়ানো মেয়েগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে? ভগবান!

'মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে আসে—'

কে বলছে কথাগুলি? কনক শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকায়।

'আর খালি মা মা করে।'

কনকের হৃৎপিণ্ডে আচমকা টান পড়ে।

'তারপর খোঁজে আজান চাচাকে। শেষকালে এই খেলনার মোটরটি বুকে জড়িয়ে ধরে। ওটা সেখান থেকেই সঙ্গে করে এনেছিল—'

কনক কথা বলতে চায়, যে কেন কথা হক, যাকেই উদ্দেশ করে বলা হক সেকথা। নিজের গলার স্বর সে নিজে শুধু একবার শুনতে চায়। কথা বলাব শক্তি কি কনকের লোপ পেয়ে গেল চিরদিনের জন্যে ?

'ও বাচবে না। ওর মরাই ভালো—যত শিগগীর মরে-'

হঠাৎ লাউডস্পীকার গর্জন করে উঠল--

'স্বেচ্ছাসেবকগণ, শুনুন। স্বেচ্ছাসেবকগণ, শুনুন। শুনুন—আমি শিয়ালদা রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি থেকে বলিতেছি—আজ সকাল আটটা হইতে শোভারাণী কুণ্ডুকে পাওয়া যাচ্ছেন। শোভারাণী কুণ্ডু, বয়েস চব্বিশ বৎসর, বাড়ি বাইনা-নগর, ঢাকা, বাইনানগর, ঢাকা। স্বামীর নাম—'

উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল কনক, হুঁশ হল প্রিয়নাথের কথায়।

'কি সঙের মত দাঁড়িয়ে আছ—চল।' হাত ধরে হেঁচকা মারল প্রিয়নাথ।

প্রিয়নাথের হাতে নিজেকে সঁপে দেয় কনক। গা রীরী করা ক্লান্তিতে সারা শরীর এখন তার অবশ হয়ে আসছে, কেমন একটা রিক্ততায় খাঁ খাঁ করছে সমস্ত মন। ইশ্, এর চেয়ে যদি মুহূর্তে চেতনা হারিয়ে এই এখানেই টলে পড়ে যেত কনক ! ভগবান !

'পর্দাটা ফেলে দেব ?'

'থাক—।

'রোদ আসছে যে।'

'হাওয়া আসুক।'

'তবে হাওয়াই খাও।' আড়চোখে কনকের দিকে তাকিয়ে হেসে প্রিয়নাথ রিক্সাওলাকে ঠিকানা বাৎলে দেয়, 'ফুর্তি ফুর্তি চল ব্যাটা, বকশিশ পাবি।' তারপর দেশলাইয়ের ওপর সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে জিজ্ঞেস করে, 'এবার বল দিকি, দেখলে কেমন? কেমন বুঝলে?'

'হুঁ।'

'জ্যাঠাইমাকেই পাওয়া গেলনা—এই যা দুঃখু!' চুক চুক শব্দে প্রিয়নাথ আফশোষ জানায়, মিটি মিটি হাসে।

কনক মুখ ফিরিয়ে প্রিয়নাথকে এক পলক দেখে নেয়, জবাব দেয় না।

'যাগগে, জ্যাঠাইমার কপালই খারাপ! আমাদের কি দোষ—'

'তোমার বাড়ি না বাঙাল দেশে?'

'বাঙ্গাল দেশে মানে? খাস ঢাকায়—তোমার মত ঘটি নই আমি, আসল বাঙাল—বুঝলে—হেঁঃ হেঁ।' ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে প্রিয়নাথ পরপর কয়েকটা টান মারে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে পরে বলে, 'প্রথমে যেটাকে দেখলাম—সুবিধের হবে না। বড্ড ক্যাটকেটে—শালি খাস নোয়াখাইল্যা।'

'তাতে কি—বাঙাল তো।' পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসে কনক, 'তোমার স্বদেশের লোক!'

সরাসরি মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে কি হবে, কনকের হাসি যেন প্রিয়নাথ দেখেনি, তার বাঁকা বাকা কথাগুলিও যেন

শোনেনি। বলে, 'তার পরেরটাও অখাদ্য। শরীরে একখাবলা মাংসও নেই, এর ওপর আবার ধামা বেঁধে বসে আছে।'

'হুঁ!'

'অবিশ্যি ও খসাতে কতক্ষণ। কিন্তু মালটাই অচল, এক্কেবারে পাকান সিটেমারা শরীর। অনেক কাঠ খড় পোড়ালে যদি—'

বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে কনক। চুপচাপ। এখনো যেন চোখের সামনে ভাসছে হাজার কয়েক মানুষের এক ছাঁচে ঢালা মুখগুলি—একটি দুর্দৈবের আঘাতে এক গেছে সে সব মুখের আদল। এখনো কানে বাজছে দুর্বোধ্য একটানা এক গুঞ্জন-ধ্বনি, এক সুরে বাঁধা একটি হাহাকার—শেষ রাতে দূর থেকে শোনা ছেলে-মরা বাতাসীর ঘুমের ঘোরে কান্নার মত।

রিক্সার ঝাঁকুনির সঙ্গে নিজেকেও একবার ঝাঁকি দিয়ে নেয় কনক। ঝিঁ-ঝিঁ ধরা মাথাটা সাফ সুফ করে নিতে চায়। ঝাঁ ঝাঁ করছে কাঠকাটা রোদ্দুর। তেষ্টায় গলা আঠা আঠা হয়ে আসছে—কিন্তু দমভর জল খেলেও এ তেষ্টা মেটবার নয়। এক যদি নিজের চোখের নোনতা জলের স্বাদে কিছুটা শান্তি আসে, ঠাণ্ডা হয় মন।

'আমি বলিকি—সৌরভি, রাধা, কামিনী আর শেষ কালের ওইটে. অবিশ্যি ওর বাচ্চাটা যদি আজকের মধ্যেই টেঁসে যায়—'

ঝিঁ-ঝিঁর ডাক বন্ধ হয়ে হঠাৎ দপ করে ওঠে কনকের মাথা। দুই চোখে আগুন জ্বেলে তাকায় সে প্রিয়নাথের দিকে।

'কাল থেকেই তা'হলে আমাদের কনকরাণী—'

'মুয়ে আগুন কনকির!' ফোঁস করে ওঠে কনক, 'তার কি

দায় কেঁদেছে! তোর বিয়ে-করা মাগকে এনে লাগানা হারামজাদা।'

অবাক প্রিয়নাথ। বড় বেশী অবাক।

হঠাৎ এত বেশী অবাক হয়ে যায় যে সগু-ধরানো সিগারেটটা হুট করে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে অবাক স্বরে প্রশ্ন করে, 'ব্যাপার কি গো, অ্যাঁ? বলি ব্যাপার কি? বৈরাগ্যি? কাল রাতে কি মাত্রাটা—।' কথা শেষ না করেই জবাবের জন্যে কনকের মুখের দিকে চেয়ে থাকে হাঁ করে। জবাব না পেয়ে কনকের মুখখানাকেই দেখে ভালো করে। অবাক চোখে।

এ সে-কনক নয়—কনক নামে নতুন আনকোরা একটি মেয়েকে যেন দেখছে প্রিয়নাথ। এ যেন কনক নয়, সুরবালা। অভাবের তাড়নায় প্রিয়নাথের এক ডাকেই ঘরের বার হয়ে এসেছে গৃহস্থ ঘরের কুমারী কন্যা—কিন্তু ঘরে লোক বসানোর নামেই প্রথম দিন কী তার রোখ্! আহা, কিছুই যেন আগে থেকে জানতনা বুঝতনা বাইশ বছরের ধুমসী মাগীটা! বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবার জন্যেই যেন রাত-আঁধারে প্রিয়নাথ বার করে এনেছে তাকে।

কনক মুখ ঘুরিয়ে থাকে।

'ভালো ভালো! এই না হারকাটার সতিসাবিত্তীর মুখের মত কথা! তা—আমাকে এসব শুনিয়ে লাভ কি সোনা—যা বলবার গিরিধারীলালকেই—'

'কেন? ওই পোড়ারমুখো মিন্সেকে আমি বলতে যাব কেন র‍্যা? তুই ওর মাইনে-খেকো দালাল, আমি ওই মেড়ো

ব্যাটার বিয়ে-করা পরিবার নাকি ? যা বলতে হয়—'
'আঃ কন্‌কি ! দিনদুপুরে রাস্তার মাঝখানে—'
'উঁ-হুঁ-হুঁঃ—নজ্জায় মরে গেলেন ! ওরে আমার নজ্জাবতী লতারে ! বলি, ওরে হারামজাদা শূয়ার, তুই নামবি রিস্‌কা থেকে, না আমিই নেমে নতুন রিসকা করব ?' কনক ফেটে পড়ে, থরথর করে কাঁপে সারা শরীর। আগুন ছোটে দুই চোখ দিয়ে।

অবাক প্রিয়নাথ। বড় বেশী অবাক। হঠাৎ এত বেশী অবাক হয়ে যায় যে কনকেব কথার সাথে সাথে রিক্সাওয়ালাকে বলে বসে, 'এ্যাই এ্যাই—রোক্‌কে !'

অতিমানুষ

মাত্র কয়েক চুমুক রক্তের অভাবে রমজান দিনকে দিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। হয়ত বা একদিন মরেই যাবে।
তবু এক ফোঁটা রক্ত পাবারও যো আছে নাকি!
রক্ত তার শরীরের জন্যে প্রয়োজন নয়, রক্ত সে খেতে চায়।

একদিন রমজান রক্ত খেয়েছিল। হোক তা নিজের ছেলের রক্ত তবু কি সে-স্বাদ ভোলা যায় সহজে! কেমন ঈষদুষ্ণ নোনতা নোনতা অদ্ভুত এক স্বাদ!
সেই থেকেই জোরালো বাসনা তার মানুষের রক্তপানের। এ বাসনা সব সময় তুষের আগুণের মত মনের মধ্যে জ্বলে। স্বপ্নেও রসনায় রস গড়ায়। জাগ্রতে মাঝে মাঝে পাগলের মত হয়ে ওঠে।
কিন্তু, মানুষটা রমজান কি আসলে সত্যিই পাগল? না। সাধারণের মধ্যে অতিসাধারণ। ব্যতিক্রম শুধু এক জায়গায়—মানুষের রক্তপানের অমানুষিক তৃষ্ণায় সে সর্বদা উদ্ব্যস্ত।
এমনও হয়, কখনও কখনও নিজের হাত কামড়ে ধরে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত গড়ায় বা রক্তের ঢল নামে। আর তাই তখন সে জিব দিয়ে চেটে চেটে নেয়, ঠোঁট বসিয়ে চুষতে থাকে।
কিন্তু উঁহু, এতে তৃপ্তি নেই। খানিক পরে ক্ষতটা চিন চিন করে,

মাথা ঝিম-ঝিমিয়ে ওঠে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে—জ্বালা-জ্বালা করে।

প্রথম প্রথম আরও বেশী জ্বালা-জ্বালা করত চোখ, জলের রেখা নামত গাল বেয়ে। তখন তার স্বাদও রমজান নিয়ে দেখেছে, অনেকটা রক্তের মত।

চোখের পানি আর মানুষের খুনের স্বাদ অবিশ্যি এক নয়, তবু আপশোষ, আজকাল তার চোখ দিয়ে গাল বেয়ে পানির ঢলও আর নামে না।

ভুখাঁয় ওকে মর-মর দেখে কাফিখানার শরাফতের মনটা বুঝি মাঝে মাঝে মেহেরবানীতে মোচড় দিয়ে ওঠে। তুন্দ্‌বীর দুয়েকটা টুকরো গোস্তর ঝোল মাখিয়ে ওর হাতের মুঠোয় গুঁজে দেয়। কিন্তু তা গলা দিয়ে নামে না, অভ্যেসমাফিক খানিক চিবুনোর পর বারকয়েক ঢোঁক গেলার চেষ্টা করেই রমজান তা উগড়ে দেয়। থুতু ফেলে ঘনঘন।

আসলে মানুষের রক্ত চাই রমজানের।

কিন্তু মানুষের রক্ত পাওয়া ভারী মুশকিল। রাস্তায় চৌমাথায় গলির মোড়ে গাড়ি-বারান্দার নীচে যে সব মানুষ ফ্যা-ফ্যা করে ঘোরে, ডাস্টবিনের খাবার খুঁটে খায়, দোরে দোরে হত্যে দেয় হন্যে কুকুরের মত, আর শেষ পর্যন্ত যেখানে-সেখানে হেগে-মুতে কি গাড়ি চাপা পড়ে মরে থাকে—তাদের রক্ত চায়না রমজান। সুস্থ সবল বড়লোক মানুষের রক্তেই ওর লোভ। কেমন স্বাদ তাদের রক্তের? টকটকে লাল পাতলা রক্ত একটু একটু করে ঘন হয়ে আসছে, জিভের আরামে সেই রক্ত চুকচুক করে তারিয়ে

তারিয়ে চুষে খেতে কী যে তৃপ্তি! গলার ভিতর দিয়ে সেই রক্ত যখন বুকে গিয়ে নামবে, বুক তখন নির্ঘাত তার ফুলতে থাকবে জোয়ার-লাগা গাঙের মত। স্রোতের মুখে নাওয়ের মত হাল্কা হয়ে যাবে শরীরটা। এবং ঘন হতে হতে সেই রক্ত যদি জমে একেবারে কালো হয়ে যায়—আহা-হা—কড়া-জ্বালের তালের পাটালির মত তা চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়ার যা মজা!

ভেবেই সারা শরীর থরথর করে ওঠে, হাড়ে হাড়ে ঠোক্কর লাগে। জিভ দিয়ে চুকচুক করতে করতে মনটা রমজানের দুর্বোধ্য অকথ্য এক চাপা আক্রোষে গুমরে মরে।

'ইস! দেখলা নি, মোটরটা বাহারের হুস কইরা গেল গিয়া!' রমজান ঘাড় উঁচিয়ে দাঁড়ায়, 'হালার গর্দানটা য্যান দুম্বাররে!' মাড়ির পেশী কড়কড় করে ওঠে, শিরাবহুল হাতের আঙুলগুলি টানটান হয়ে যায়—সাঁড়াশির মত।

তারপর উত্তেজনা অবসাদে থিতিয়ে আসতে না আসতে পেটের নাড়িগুলো পাকে পাকে জড়িয়ে যেতে শুরু করে—খিদে!

খিদে!

অন্তত একদিন খেলে পরের দু-তিন দিন উপোস অনায়াসেই দেয়া চলে—কমাসের মধ্যেই বাপ-বেটার সেটা বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই একদিন জোটাই যে ভার!

আর খিদেটা মাত্রা ছাড়ালে জিভটা আঠাআঠা হয়ে নাড়ির টানে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে চায়, কাঠফাঠা রোদ্দুরেও আঁধার ঘনিয়ে ওঠে চোখের তারায়, হাঁটু দুমড়ে আসে—জোর-

জবরদস্তি যেন নামাজে বসাতে চায়—যেন খোদার দরবারে একবার শুধু আর্জি পেশ করলেই বেহেশ্‌ত থেকে হুরীর দল নেমে আসবে খাবারের থালা নিয়ে !

এদিকে এক লহমা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে কি, ছকু অমনি চিঁ চিঁ করে ডাক ছাড়ে, 'বাজান !'

খোঁড়া পা'টা ঘসড়াতে ঘসড়াতে রমজান ফের চলতে শুরু করে। ছেলের ওপর গোশা হয়, কিন্তু মুখে কিছু বলে না—এক হেঁচকায় হাত ধরে তার টান মারে। ছকু কঁকিয়ে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে হাতের মুঠো আল্গা করে দেয়, ভয়ে ভয়ে তাকায় ছকুর মুখের দিকে। না, ঠিক আছে, মা'য়ের চেয়ে তাগদ বেশী ব্যাটার শরীরে। আচমকা এক ধাক্কা মেরেছিল বলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে মরে গিয়েছিল ছকুর মা। তারপর কত ডেকেছিল রমজান কত সোহাগ জানিয়েছিল, আমিনা তবু সাড়া দেয়নি। সোয়ামীর হাজার ডাকে শত সোহাগেও যে মরা বউয়ের সাড়া দেয়ার সাধ্য থাকে না সেটা রমজান বুঝেছিল ঘণ্টা তিনেক পরে। আর বুঝে যত না দুঃখিত তার বেশী হয়ে গিয়েছিল অবাক। মরা মানুষের সাড়া না দেয়ায় অবাক হওয়া নয়, আমিনার এমন বেবুঝের মত মরে যাওয়ায় অবাক। এতদিন একসঙ্গে ঘর করেও বউটা বুঝল না যে সত্যি সত্যি মেরে ফেলার জন্যে রমজান তাকে ধাক্কা দেয়নি, নিজের খিদের জ্বালাটাকেই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল—আমিনা শুধু সময়মত সামনে পড়ে গিয়েছিল, এই যা ? আমিনা না থাকলে নিজের কপালটাকেই হয়ত সে ধাক্কা দিত দাওয়ার

খুঁটোয়। এসব কি জানত না আমিনা? জানত, সব জানত—নেহাৎ তাকে জব্দ করার মতলবেই অসময়ে এভাবে মরে গেল মাগিটা—পেটের খিদের সাথে মনের দুঃখটাও যাতে রমজানের সমান তালে চলতে পারে, তাই!

আলতো মুঠোয় রমজান ছকুর হাতের গোটা তিনেক আঙুল ধরে থাকে—আমিনারই তো পেটের পোলা! এবং হাঁটে। খানিক এভাবে হেঁটে গেলেই যেন তার আর ছকুর খিদেটা উবে যাবে, গোয়ালন্দে স্টীমার থেকে নেমে যেমন ভেবেছিল হিন্দুস্তানের গাড়িটা খুঁজে পেলেই কমতে শুরু করবে খিদের তাড়না, মন থেকে মুছতে থাকবে ছকুর মায়ের পড়ে গিয়ে মরে থাকার ছবিটা।

আস্তে আস্তে সন্তর্পণে ছকুর হাতটা মুঠো করে ধরে। আজ আমিনা থাকলে হয়ত তার একটি হাতও এমনি করে ধরত।

ঘুরতে ঘুরতে একটি গলির মোড়ে এসে থমকে দাঁড়ায়। হিন্দু পাড়া—ভেতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবে কয়েক সেকেণ্ড।

সুন্দর একটা বাস্না হাওয়ায় ভেসে আসছে।

পিচমোড়া নাতিপ্রশস্ত গলি, আলোর চেকনাই, দুপাশে বাড়ির বাহার। কোন সাহসে ঢোকে সে এই গলিতে, এই হিন্দু-পাড়ার গলিতে? কিন্তু হাওয়ায় ভেসে আসা বাস্নার স্বাদে জিভ যে চপচপে হয়ে ওঠে!

সদর রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রমজান একটু ইতস্তত করে। এদিক-

ওদিক তাকায়। তারপর পা বাড়ায় ভয়ে ভয়ে। কিন্তু বেপাড়ায় এত আলোয় এত ভালো রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে কেবলই দুই পা তার জড়িয়ে আসে। হঠাৎ নজরে পড়ে—হাতটাক চওড়া একটা পথ চলে গেছে পাশ দিয়ে। মুখ নাড়তে নাড়তে একটা কুকুর বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে। রমজানও ছুট করে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। অনেকখানি পথ এক নজরে ঠাহর হয় না, কিন্তু নিশাচর জানোয়ারের মত জ্বলছে তার দুই চোখ। সেই চোখের আলোয় পথ চিনে চিনে অবশেষে সে ঠিক জায়গায় এসে পৌছোয়।

আঃ! ছকুর হাত ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রমজান।

জালতি-আঁটা জানালা দিয়ে রান্নাঘরের ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। কড়াতে একটু আগেই কি যেন সম্ভার দেয়া হয়েছে, এখনও তা থেকে ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ উঠছে সম্ভারের উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে এসে লাগার সঙ্গে সঙ্গে কস বেয়ে খানিকটা লাল গড়িয়ে পড়ে। চোখ বুঁজে মুখ বুঁজে জিভ নিয়ে রমজান খেলা করতে শুরু করে দেয়। ঘনঘন শ্বাস টানে। থেকে থেকে হাঁ করে হাওয়া গেলে। শরীরে কেমন এক নেশাড়ে আমেজ নামে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আলগোছে একবার জানালার জালটা ছোঁয়, নখ দিয়ে বারকয়েক আঁচড় কাটে তার ওপর।

'বাজান!' ফিস ফিস করে ছকু ডাকে।

'চুপ-র ছ্যামরা!' রমজান চাপা ধমক দেয়।

এঁদো গলির একেবারে শেষ মাথায় বাড়িটা। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে সামান্য একটু পিছু হটে রমজান, যাবে কি যাবে না,

থেকেই বা কি করবে—-এই সব বুঝি ভাবে জালতি আঁটা জানালার ওপর অপলক চোখ রেখে ক্ষুধার্ত ছেলের হাত ধরে নিজের বুকের ধুকধুকি শুনতে শুনতে।

ভারী সাজানোগুছনো রান্নাঘর। আলমারী, তাক। রূপোর মত ঝকঝকে বাসনকোসন। ছুটি শিকেয় হাঁড়ি-পাতিল তাকের ওপর থেকে রাঁধুনী একটা বয়েম নামাল, ঘিয়ের বয়েম। চামচে করে তার থেকে ঘি নিয়ে কড়ায় দিল। তারপর বয়েম রেখে দিয়ে একটা হাতা তুলে নিল।

কড়াইয়ের সঙ্গে হাতার ঘর্ষণের শব্দ আর ঘিয়ের গন্ধ! ছ্পা এগিয়ে যায় রমজান।

'বাজান।'

'আঁই-চোপ!'

পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে মাথা তুলেছিল ছকু, ধমক খেয়ে বাপের কোমর জড়িয়ে ধরল।

মাঝবয়সী একজন মেয়েমানুষ ঘরে ঢুকে কি যেন রাঁধুনীকে বলে গেলেন। তাঁর কথা শোনা না গেলেও বোঝা যায় যে ইনিই বাড়ির গিন্নি—রান্নার তদারক করে গেলেন সম্ভবত। গাঁয়ে থাকতে রমজান যখন জন খাটত লাঙল ঠেলত, মাঝে মাঝে তখন খেতে পেত বাবুর বাড়িতে—মস্ত উঠোনের একপাশে পাত পড়ত তাদের, ভাত তরকারী বেড়ে দিত অন্য লোকে কিন্তু গিন্নিঠাকরুণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন সামনে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারক করতেন। বড় জোতদার খানদানী পরিবার —ধনী লোক মানী লোক। ধনী-মানী লোক এরাও। এই

গিন্নিঠাকরুণকেই তো দেখতে অনেকটা—

'কও কি বাজান ?'

নিজের মনেই রমজান বিড়বিড় করছিল, ছকুর কথায় চুপ করে গেল। তবে এবার আর সে ধমক দেয় না ছেলেকে। সাহস পেয়ে ছকু বাপের কোমর ছেড়ে নিজেই ঘাড় উঁচিয়ে দাঁড়াল নর্দমার বাঁধানো কিনারে।

'এনারে বাবুর বাড়ির ঠাকরোণের নাখাল ছ্যাখতে, নারে ছকাই ?'

ছকু জবাব দেয় না। তারই বয়েসী একটি ছেলে এসে ঘরে ঢুকেছে, খাবারের তাড়া দিচ্ছে। অবিকল মুনীরের মত গোলগাল গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, পেসিডেন্ মমতাজ মিঞার ছোট ছেলে মুনীর—বাড়ি থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ছকুর সঙ্গে যে ঘুরে বেড়াত বনে-বাদাড়ে, বাপের কাছে বারবার পিট্টি খেয়েও তার দোস্তিতে যে ইস্তফা দেয়নি।

মুইন্যা বলেই হয়ত ছেলেটিকে ডেকে উঠত ছকু, কিন্তু রমজান ততক্ষণে তার একটি হাত চেপে ধরেছে—নিজের ছেলেকে কোলে টেনে নিয়ে পরের ছেলের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। পোলাপান মানুষের চেহারা এমন ঘাড়ে-গর্দানে না হলে মানায় ? যুৎসই খেলেই চেহারার জৌলুষ খোলে, চেকনাই বাড়ে, ঘি-দুধ পেটে গেলে মানুষ মোটা হয়, রমজান তা জানে। কারণ সেই সব খাদ্য শরীরের ভেতরে গিয়ে রক্ত মাংস তৈরী করে, দেহে তাগদ আনে। কতদিন আগে কোন্ ছেলেবেলায় মাস্টার-সাহেবের কাছে কথাগুলি শুনেছিল, এখনও কিন্তু

ঠিক ঠিক মনে আছে। পেট পুরে খেতে পেলে তার ছকুও আজ অমনি তাগড়া-তোগড়া হয়ে উঠত। কিন্তু কেন হল না?

না, খেতে পেল না।

কেন খেতে পেল না? পাকিস্তান তো হল? তবু কেন খেতে পায় না গাঁয়ের চাষাভুষো মানুষেরা? খিদের জ্বালায় কেন তাদের দুষমন দেশ হিন্দুস্তানে চলে আসতে হয়—আবার হিন্দুস্তানে এসে মরতে হয় না খেয়ে বা ছোরা খেয়ে? কেন?

অ্যাঁ, কেন?

আর শুধু কি পাকিস্তানে—হিন্দুরাও তো হিন্দুস্তান চেয়েছিল—তবু কেন এদেশের গরীবরা না খেয়ে মরে? পাকিস্তানের হিন্দুরা জানের ভয়ে পালিয়ে এসে না খেতে পেয়ে জান দেয় হিন্দুস্তানে! কেন?

অ্যাঁ, কেন?

এ এক আজব ধাঁধাঁ।

আসলে ধাঁধাঁটাধাঁ কিছু না—সব খোদা, খোদাতালার মর্জি সব। নইলে নিজের দেশ ছেড়ে রমজান চলে আসে এখানে, তেষ্টায় পানি জোটে না যেদেশে? এতকাল পাশাপাশি ঘর করেও লক্ষ্মণ কিনা ভয় পায় রমজানকে—যে লক্ষ্মণকে দাঁতালের মুখ থেকে জান কবুল করে দু'বছর আগে বাঁচিয়েছিল রমজান নিজে? রাগের মাথায় কিই-বা এমন সে বলেছিল যে রাতারাতি গাঁ ছেড়ে পালাল লক্ষ্মণ গুষ্টিশুদ্ধু সঙ্গে নিয়ে? শুধু কি লক্ষ্মণ? লক্ষ্মণরা! তার হঠাৎ-জাগা রাগটাই শুধু ওরা দেখল,

আর লক্ষ্মণের ফাঁকা ভিটের দিকে তাকিয়ে যে ঝবঝর করে সে কেঁদে ফেলেছিল, লক্ষ্মণের জন্যে মোনাজাত করেছিল খোদার দরবারে, সেসব কিছু না? আসলে সব খোদা, খোদাতালার মর্জি সব। নইলে অমন জলজ্যান্ত মেয়েমানুষটা এক ধাক্কায় পড়ে গিয়ে মরে থাকে? মরার আগে একবার ভাবে না পর্যন্ত যে এভাবে সে চলে গেলে তার সোয়ামীর কি হবে, ছেলের কি হবে!

সব হারামজাদা, হারামজাদা!

না না, হারামজাদা নয়, আসলে সব খোদা, খোদাতালার ইচ্ছেতেই যা হবার হয়!

আদর করে ছেলের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে একে একে ছেলের বুকের পাঁজর গোণে রমজান।

তরকারীর কড়া নামিয়ে উনোনে দুধের কড়া বসাল রাঁধুনী। ছোট্ট পুকুরের মত এককড়া শাদা দুধ টলমল করছে। একটু পরেই তাত লেগে উথলে উঠবে, টগবগিয়ে ফুটতে থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে হাতা দিয়ে না নাড়লে কড়ার গা বেয়ে উনোনে পড়বে। দুধ পোড়ার কটু উগ্র একটা গন্ধ আছে। সেই গন্ধের বিস্মৃত স্মৃতিটাকে রমজান রোমন্থনের চেষ্টা কবে। চোখ জোড়া তার কড়াব ওপব আটকে গেছে—দুধ ফাঁপছে, দুধ ফুলছে। এরপরই ফেটে যাবে, ফুটতে থাকবে। কখন, কতক্ষণে ওই দুধ উথলে উঠে আগুণে পড়বে আর দুধ পোড়ার সেই কটু উগ্র গন্ধটা নাকে এসে লাগবে রমজানের? লাগবে কি!

'বাজান ! ধ্যেৎ !'

তাড়াতাড়ি ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়ে রমজান বলে, 'কথা কইসনা বাপ, কথা কইসনা—ছাখ, চুপ কইরা ছাখ।' তারপর ছেলের দেখতে অসুবিধে হচ্ছে ভেবে নিজেই তাকে কোলে তুলে ছাখায়।

একহাতে বাপের গলা পেঁচিয়ে ড্যাবড্যাবে চোখদুটি ছকু জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দেয়—অন্য হাতের আঙুলগুলি মুখে পুরে চুষতে থাকে প্রাণপণ।

ছোট বড় কয়েকটি থালায় ভাত বাড়ছে রাঁধুনী। হাতা দিয়ে হাঁড়ি থেকে ভাত বার করছে, গরম ভাতের হালকা হালকা ধোঁয়া উঠছে। আর গন্ধ !

ভাতের গন্ধ !

'বাজানূরে, কত্তো'—

'হু হু—আঁই।' ধমক নয়, কথাটা রমজান এড়িয়ে যায়। আসলে কথা বলবার ইচ্ছে নেই অবসর নেই তার। চোখ দিয়েই যেন সে গরম গরম ভাতগুলি গোগ্রাসে গিলছে। অমন গরম ভাতে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়, তবু সে হাত সরিয়ে নেয়া অসম্ভব। মুখে দিলে গলা থেকে বুক পর্যন্ত জ্বলে ওঠে, তবু উগড়ে ফেলা অসম্ভব। ভাত ! দলা দলা গরম ভাতের গ্রাস ! ওই এক কড়া দুধের বদলে এক শানকি ভাত পেলেই রমজান আজ বেশী খুশি, খু-ব খুশী।

চুপচাপই ছকু ছিল, রমজান তবু বলে, 'কথা কইসনা বাপ, ছাখ, চুপ কইরা দেইখা যা।'

'অতগুলান উয়ারা খাইব ? আমাগোরে দু'গা দিবনা বাজান ?'

'দিবরে, দিব দিব।' ছেলেকে না, নিজের মনকেই যেন সে প্রবোধ দেয়। ইস, ব্যঞ্জনই দেখ কত রকমের, ডাল-ঝোলের বাটিই গোটাচারেক, আঁই! একসঙ্গে এত খাদ্য কি খেতে পারে মানুষ? ইচ্ছে করলেও কি পারে? আঃ?

'বাজান', বাপের থুতনি ধরে ছকু বলে, 'এ্যাহনি দুগা চাইয়া লও না ক্যান বাজান, নাইলে হগ্‌গলটি উয়ারা খাইয়া ফেলাইবনে।'

'খ্যাপচস! মান্‌ষে নি পাবে—'

থালার ওপর বাটি সাজিয়ে রাঁধুনা একে একে সেগুলি বাইবে নিয়ে যায়। তার যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে বমজানেব চোখ দুটিও ঘর-বার করে। ভাত দেয়া শেষ করে রাঁধুনা দুধের কড়া সামনে টেনে আনে, হাতা দিয়ে বাটিতে বাটিতে দুধ ভাগ করে। রমজানের সেদিকে দৃষ্টি নেই—ভাতের হাঁড়িটা খোলা পরে আছে, ভাত দেখা যায় না, কিন্তু হাঁড়িতে ভাতের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। একেবারে যেন শরীরী অনুভব। হাতের আঙুলগুলো শিরশিরিয়ে ওঠে, যেন গরম ভাতেব তাত লেগেছে! লালায় জিভ জড়িয়ে আসে।

এক ঢোঁক থুতু গিলে হঠাৎ রমজান এক বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসে, 'হাঁরে ছকাই, তুই কত্তগুলান ভাত খাইবার পারস ক দেহি, আঁই?'

'আমারে নি কও?' বাপের সন্দেহজনক সওয়ালটাকে ছকু একবার ঝালিয়ে নিতে চায়।

'আরে হ হ—তরে নাইলে কমু কারে? আর আমার আছে

কেডা !' অপার অপত্য স্নেহে ছেলের শরীরটাকে সে পিষতে থাকে।

'এ্যাই এ্যাই—এ্যা-ত্তো।' শূন্যে যতদূর সম্ভব নিজের হাত দুটি বিস্তৃত করে দেখায় ছকু।

'আরেঃ শয়তান! কি অদেখিলা দিশারে তর!' কথাগুলি বলে ফেলেই সচেতন হয়ে গিয়ে রমজান নিঃশব্দে হাসতে থাকে। হাসির দমকে সারা শরীর কাঁপে।

'আর তুমি বাজান ?'

'তর থেইকা বেশী তো খামুই।' মুরুব্বির মত ঘনঘন মাথা নাড়ে, 'বয়সটা কত আমার জানসনি ? তর বাপ না আমি ?'

ওদিকে ঘর-বার করছে রাঁধুনী, এদিকে চোখের দৃষ্টি অপলক রেখে প্রতি মুহূর্তের হিসেব কষছে রমজান। ইস, খেতে এত দেরী হয় কেন ওদের! খেতে বসে নিশ্চয় যত রাজ্যের গল্প শুরু করে। হ্যাঁ আলবৎ! দূর থেকে মাঝে মাঝে বাবুর বাড়ির ছেলেমেয়েদের খাওয়া সে দেখেছে কিনা তাই এদের হাল-হকিকৎ সব তার পুরোদস্তুর জানাশোনা। খেতে বসে ছাড়া যেন আর গল্প করার ফুরসৎ জোটে না! কিম্বা হয়ত ভাত নিয়ে পাইজামি শুরু করেছে বাচ্চারা, গিন্নিঠাকরুণ ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাওয়াচ্ছেন।

রমজান কিন্তু তিন গেরাসে এক থালা ভাত সাবার করে দিতে পারে—যা-না থালার নমুনা—বড় জোর চার গেরাস। তাই বলে এত দেরী!

রমজান ছটফট করে। ছকুকে কোল থেকে নামাবে কি নামাবে

না ভাবতে গিয়ে দেখে ছকুও ঠায় তাকিয়ে আছে ঘরের দিকে আর ওদিকে গুটিগুটি পায়ে একটা কালো বেড়াল ঘরে ঢুকছে দরজা দিয়ে। ঘরের মধ্যে সবকিছু খোলামেলা পড়ে, রাঁধুনী নেই। ছকু হিস হিস করে উঠল, থমকে দাঁড়াল বেড়ালটা, মুখ তুলে এপাশ-ওপাশ তাকাতে লাগল।

'চোট্টা !'

'হালা !' হিস হিস করে নয়, বোধ হয় সরাসরি ধমক দিয়েই বেড়ালটাকে তাড়াবার জন্যে রমজান জানালার কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল, রাঁধুনি ফের ঘরে ঢুকল।

দুহাতে তার কয়েকটি থালা। থালার ভুক্তাবশেষের দিকে তাকিয়ে রমজানের দেহে নতুন করে রক্ত চলাচল শুরু হয়। এই এতক্ষণে যেন প্রত্যাশিত ছবিটি তার চোখে পড়ল। পেটটা ঘনঘন পাক দিতে থাকে, থুতুতে সারা মুখ ভরে যায়, চোখের পাতা ওঠা-নামা করতে শুরু করে ঘনঘন।

কিন্তু, ওকি ওকি !

এক লহমায় ছকুকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে রমজান চাপা চিৎকার করে ওঠে। ঠিক চিৎকার নয়, বুকফাটা আর্তনাদ।

একে একে থালা থেকে ভাতগুলি নর্দমায় ফেলে দিচ্ছে রাঁধুনী।

'আরে আরে করকি, রও রও!' পাতের এঁটো কয়েকমুঠো ভাত-তবকারী নয়, রমজানের আর্তনাদ শুনে মনে হয়, কেউ যেন তার কলিজাটাকেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে নর্দমায় ছুঁড়ে দিচ্ছে।

থমকে গেল রাঁধুনী। চমকে উঠল। তারপর জালতি-দেয়া জানালার আড়ালে আধো-আলোয় আধো-অন্ধকারে ক্ষুধার্ত

রমজানের গোঁফদাঁড়ি ভর্তি বীভৎস বিস্ফারিত মুখমণ্ডল দেখে ভয়ার্ত চিৎকারে ফেটে পড়ল, 'মোছলমান! মোছলমান! খুন খুন—ওরে বাবারে—'

'আরে না না—আমি খুনী না, খুনী না—'

'খুন! খুন! মোছলমান—খুন—মেরে ফেললে বাঁচা-ও—'

কি যেন হয়ে গেল দেখতে দেখতে। তমুল হল্লা। হট্টগোল। হইচই। ছোটদের চিৎকার। মেয়েদের কান্না। পুরুষদের হুঙ্কার।

'ওরে লাঠি আন, লাঠি আন। সাবধান! হুঁশিয়ার! রাম সিং, বন্দুক—'

প্রথমটা রমজান রীতিমত বেকুব বনে যায়। বাপ ব্যাটায় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে পরস্পরের মুখের দিকে। ওদিকে হল্লা ক্রমেই বাড়ছে, আড়মোড়া ভেঙে যেন জেগে উঠছে এক রক্তলোলুপ প্রাগৈতিহাসিক হিংস্র জানোয়ার। ফটাফট জানালা দরজা খুলছে বন্ধ হচ্ছে। কোন্ বাড়ি থেকে যেন বন্দুকের কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজও হল।

'কি হইব বাজান!' ভয়ে সিটিয়ে গিয়ে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে ছকু, 'আমাগোরেনি কাইটা ফেলাইব! আ—বা-জান!' দুহাতে সে বাপকে জড়িয়ে ধরে।

ভয় রমজানও পেয়েছে, কান্নাও পাচ্ছে তার,—ভয়-মেশান দুঃখ-মেশান ভয়ানক কান্না। কিন্তু সে সবের অবসর কই এখন? ঝটপট সে এপাশ ওপাশ তাকিয়ে নেয়। গলি দিয়ে ফেরা অসম্ভব।

গলির মুখে এতক্ষণে নির্ঘাৎ ভিড় জমে গেছে, আর মুখ পর্যন্ত যে পৌঁছুতে পারবে তারই বা ঠিক কি—তার আগেই হয়ত দুপাশের বাড়ি থেকে ইটপাটকেল লাঠিসোটা পড়তে শুরু করবে। সামনের দিকে তাকায় রমজান, নালার ওপাশে বড় এক নর্দমা, তারপর ইটের পাঁজা, তারপর—তারপর অন্ধকারে আর কিছুই নজরে পড়ে না।

কিন্তু না, আর ভাববার সময় নেই। লোকজন ক্রমেই বেরিয়ে পড়ছে। হট্টগোল বাড়ছে। বন্দুকের আওয়াজ হচ্ছে ঘনঘন। হঠাৎ রমজান ছেলেকে কাঁধে তুলে নেয়, তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে সামনের দিকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁচা নর্দমায়, পড়বে যে তা জানতই, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। হাঁটু-ডোবা পাঁক লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। চোখে মুখে পাঁকের ছিটে লাগে।

ইটের পাঁজা। পোড়ো জমি। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। খোয়াওঠা সড়ক। রমজান ছুটছে। বারকয়েক হোঁচট খায়। বেখেয়াল। রমজান ছুটছে। ছুটছে তো ছুটছেই।

ক্ষুধার্ত অন্নপ্রার্থী মানুষ মানুষের পৃথিবী থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চাইছে!

হঠাৎ পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রমজান, কাঁধ থেকে তিন হাত দূরে ছিটকে গেল ছকু।

'বা-জা-ন!' একটা তীব্র আর্তনাদ—কে যেন নির্জন অন্ধকারের বুকে ছুরি মারল।

রমজান কিন্তু শুনতে পায়নি। শুনতে পাবে কি, দুই কান

তার ঝাঁ ঝাঁ করছে এখনও, নিশ্বাস নিতে গিয়ে চড়চড় করে উঠছে পাঁজর, বুকটা আথালি-পাথালি করছে, হাত-পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকে যেতে চাইছে, আগুন জ্বলছে সারা শরীরে, আকণ্ঠ তেষ্টায় গলা কাঠ।

খানিক পরে অন্ধকারে ঠাওর করে করে জানোয়ারের মত হামাগুড়ি দিতে দিতে রমজান ছেলের দিকে এগিয়ে যায়। একটু দম নিয়ে বিকৃত গলায় ডাকে, 'ছকু! অ ছকু!'

ছকু কথা কয় না।

'ছকু, ছকাই!' ছেলের মাথাটা ধরে নাড়া দেয়, 'বাপ আমার। ছকাই ধন!'

ছকু নিশ্চল। ছকু নির্বাক।

এবার অদ্ভুত এক আতঙ্কে রমজান শিউরে ওঠে। উঠে বসে তাড়াতাড়ি ছেলের মাথাটা কোলে তুলে নেয়। নাকের কাছে আঙুলগুলো উলটে ধরে।

এ কি!

'বা-জা-ন!' নিজের স্বরই নিজের কানে ছেলের কান্না হয়ে শোনাল—'ছ-কু!'

কিন্তু ছকু, রমজানের ছেলে, জবাব দিল না।

রমজানের ছেলে ছকু আর জবাব দেবেও না॥

'ছকু বাপ আমার!' ডাক ছেড়ে রমজান এবার কেঁদে ওঠে, 'মোরে ছাইরা কনে গেলিরে বা-প!'

শহরতলীর অন্ধকার নির্জনে মরা ছেলেকে বুকে চেপে

অদৃশ্য খোদা তালাকে সাক্ষী রেখে কান্নার মধ্যে দিয়ে এই একই প্রশ্ন বারবার রমজান করতে লাগল।

এ প্রশ্ন করবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার তার অবশ্যই আছে। যে ছকুকে সে জন্ম দিয়েছে, দিনের পর দিন নিজের ক্ষুধার গ্রাস যাকে ভাগ করে দিয়েছে, প্রতিটি আপদে-বিপদে বুক দিয়ে আগলে রেখেছে—হঠাৎ আচমকা বিনা নোটিশে সে যদি এমন করে চলে যায় তবে কেন নিজের দাবি সোচ্চারে ঘোষণা করবে না রমজান? গরীব হলেও ছেলের বাপ তো ও? আর শুধু কি ছকু? ছকুর মা, তার গ্রামের লক্ষ্মণ, তার গ্রাম, তার পাকিস্তান, আর গান্ধির দেশ হিন্দুস্তান—সব এক সঙ্গে একি এক ষড়যন্ত্র করেছে তার বিরুদ্ধে? কিন্তু কেন? অ্যাঁ, কেন? সে গরীব—শুধু এই কারণেই কি?

আজ যদি মুসলমান হওয়ার অপরাধে রমজানকে প্রাণ দিতে হত, বেঁচে থাকলে এই একই ধরণের প্রশ্ন হয়ত ছকুও করত।

যেখানে বাপ-ব্যাটাকে একই মুখের গ্রাস ভাগ করে খেতে হয়, বাপ-বেটার শরীরে যেখানে একই রক্ত বয়—সেখানে এই-ই রেওয়াজ।

ছকুকে বুকে জড়িয়ে রমজান তার মুখে চোখে শীর্ণ শরীরের সর্বাঙ্গে অনর্গল চুমু খেয়ে চলে। একটা দুর্বার চাপা কান্নার দুর্বোধ্য আবেগ বারবার চুম্বনের মধ্যে দিয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ে। নিজের কোন তার অনুভূতি নেই, ঠোঁট ছাড়া কোন ইন্দ্রিয় নেই—শহরতলীর অন্ধকার নির্জনে মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে অবিরাম চুমু খাওয়া ছাড়া যেন এ জীবনে আর করণীয়ও

কিছু নেই।

খিদেয় তেষ্টায় সে নিজেও ক্রমে নির্জীব হয়ে আসছিল। ছকুর দেহটা একটু একটু করে হিম হয়ে যাচ্ছে দেখে ধীরে ধীরে একটা গ্লানিকর ক্লান্তি সারা শরীরে তার ছড়িয়ে পড়ছিল। তিন দিনের অনাহারী পেটের নাড়িগুলি যখন কোমর-ভাঙা সাপের মত প্রচণ্ডভাবে পাক খেতে থাকে, মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে কত আর সোহাগ জানাতে পারে মানুষ, মানুষের মন্? তেষ্টায় ছাতি যখন বৈশাখের ক্ষেত হয়ে ওঠে, চুমু খেয়ে খেয়ে জিভের থুতু তখন নষ্ট করে লাভ কি?

যাক—। শেষবারের মত ছেলেকে চুমু খেতে গিয়ে হঠাৎ রমজানের খেয়াল হল, একি! তার ঠোঁটে জল এল কি করে!

আর এই জলের স্বাদ কেন এত নোনতা নোনতা?

ছেলের ফাটা কপালে ঠোঁট রাখল রমজান।

ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত রমজান অপার অপত্যস্নেহে নতুন করে ছেলেকে চুমু খেতে শুরু করল—দীর্ঘ বিলম্বিত চুম্বন।

মাত্র কয়েক চুমুক রক্তের জন্যে রমজান দিনকে দিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। হয়ত একদিন মরেই যাবে।

রক্ত তার শরীরের জন্যে প্রয়োজন নয়, রক্ত সে খেতে চায়। সুস্থ সবল বড়লোক মানুষের রক্ত॥

স্বপ্নমেধ

অবিনাশ তো খুশিই, সুরমারও অপছন্দ নয়; কিন্তু দেখে-শুনে একেবারে দমে গেল অনুপমা। উল্টোডিঙ্গির তুলনায় অবিশ্যি ভালো, সেখানে ঘরখানি যে শুধু ছোট ছিল তাই নয়, রান্নাবাড়াও করতে হত তারই এক কোণে। এখানে রান্নাব আলাদা জায়গা আছে—বারান্দার একধারে, দর্মাঘেরা। ভাড়াটের সংখ্যা ওপরে নীচে মিলিয়ে যেমন চার, জলের বন্দোবস্তও তেমন ভালো—কলের বদলে টিউকল। উঠোন হিসেবেও খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে—উল্টোডিঙ্গির বাড়িওলার মত ওখানে কয়েকটা দর্মার শেড তুলে নতুন ভাড়াটে বসাবার ইচ্ছে বটকেষ্টবাবুর নেই ব'লেই জানিয়েছেন। সবই তো মনের মত, সুবিধেমত, তবু—

'ঘর পছন্দ হল তো মা?' ঠেলাগাড়ি থেকে মোটঘাট নামানোর ফাঁকে অবিনাশ প্রশ্ন করেন ।

ঘাড় নেড়ে অনু জানায়, হয়েছে। কিন্তু—

মনে মনে ভয়ানক আফশোষ জাগে, কিন্তু এমন একটি জানালা কই এ ঘরে যার ফাঁক দিয়ে অন্তত দেখা যাবে এক টুকরো আকাশ আর একফালি রাজপথ? আকাশে যখন এরোপ্লেনের ঘর্ঘর বেজে উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গে থর থর করতে থাকবে তার

সারা দেহ-মন, অথবা হঠাৎ বহুকণ্ঠের জয়ধ্বনি শুনে পা'দুটি যখন তার অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠবে—কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে? বাবা যখন অপিসে বেরুবেন মা ঘুমোবেন পড়ে পড়ে আর অপু থাকবে ইশকুলে, তখন? কি করে তখন সময় কাটবে অনুপমার যদি না ঘরে এমন একটি জানালা থাকে যার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় রাজপথের অবিরাম যানবাহন-পথচারীর মিছিল? জানালার রড ধরে ঝুঁকে পড়ে ফেরিওলার সঙ্গে একটু দরদস্তুর করতে না পারলে কি দিয়ে দুপুরের অসহ্য একাকীত্ব ভরবে সে? মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে জানালার ফ্রেমে-আঁটা আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে মাঝ-রাত্তিরের হাওয়ার ছোঁয়া চোখে মুখে না নিলে নতুন করে ঘুমের ঢল কি আর নামবে তার চোখে?

অবিশ্যি জানালা যে একেবারে নেই তা নয়, বরং দুটি আছে। একটার গা ঘেঁষেই পাশের তেতলা বাড়িটা খাড়া উঠে গেছে, আরেকটি ভেতরে বারান্দার দিকে—দুটিই থাকা না থাকা সমান।

নতুন বাড়িতে আসার নামে আবিষ্কারের যে রহস্য-রোমাঞ্চিত আমেজটা অনুর মনে ঘনিয়ে এসেছিল সেটা যে এখন শুধু গুঁড়িয়েও গেল তা নয়—উল্টোডিঙ্গির বাড়িটির জন্যে মনটাও তার বড্ড বেশী খাঁ খাঁ করতে লাগল।

'অমন চুপচাপ কেন রে? ঘর বুঝি পছন্দ হয়নি?' ঝোড়াটা নামিয়ে রেখে অবিনাশ তালু দিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছে নিলেন। 'আর পছন্দ! এই যে জুটল ভাগ্যি! নেহাৎ

বটকেষ্টবাবু দয়া করলেন বলেই—ওই জামার পকেট থেকে দেড়টা টাকা বার করে দেতো মা।' টাকা নিয়ে তিনি হনহনিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

অনু অবুঝ নয়। তার বাবার মত একশ পাঁচ টাকা মাইনের কেরানির পক্ষে এর চেয়ে ভালো বাড়ি জোটান যে অসম্ভব তা সে জানে, ভালো করেই জানে। দু'বছর কলকাতায় এসেই হালচাল বুঝে নিয়েছে সে কলকাতার!

মাস্টারদা যাই বলুন, মানুষ নাকি থাকে এখানে? মাগো! কী দুঃখে যে লোকে কলকাতায় মরতে আসে! আঁতুর-হেঁসেলের বাছবিচার নেই, গুরুজন লঘুজনের বিবেচনা নেই—একখানি কি দুখানি ঘরেই সব। চাটুয্যেদের কথা মনে পড়ে অনুর, বউকে নিয়ে আলাদা ঘরে শুতে পেতনা বলে ছোট জামাই শ্বশুরবাড়িই আসত না। চাটুয্যে-গিন্নির দুঃখে অনুর মন সায় দিয়েছিলে, সুব্রতবাবুর ওপরে রাগ পর্যন্ত করেছিল—আবার চপলাদির কথারও সে জবাব খুঁজে পায়নি। সত্যিই তো, ঘরের মধ্যিখানে ছেঁড়া শাড়ির পর্দা টাঙিয়ে নতুন বরের পাশে যায় নাকি শোয়া—তা হোক না সে-ঘর যতই বড়? ভাবতেই যে গা শিরশির করে ওঠে।

অবিনাশ ফের ঘরে ঢুকলেন। একটা তোরঙ্গের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে হাত দিয়ে মুখে হাওয়া করতে করতে বললেন, 'তোর মা কোথায় রে?'

'কার সঙ্গে যেন কথা কইছে।'

'দেখিস, বেশী মাখামাখি কিন্তু ভাল নয়!' অবিনাশ স্বর

নামিয়ে আনলেন, 'এখানে শুচিবাইটা একটু কমায় যেন, লক্ষ্য রাখিস—বুঝলি না? অপুটা কই?'

'আছে ধারেকাছে কোথাও।'

'উহুঁ,' গম্ভীর ভাবে অবিনাশ মাথা নাড়লেন, ওটাকেও এবার থেকে শাসনে রাখতে হবে। পড়াশোনা কিস্সু হচ্ছে না।'

অনর্গল কথা বলে যান অবিনাশ। নতুন বাড়িতে উঠে এসে যেন জীবনের ধারাটাই তিনি বদলে দিতে চান, নতুন জীবন শুরু করতে চান,—বউকে, ছেলেকে, মেয়েকে নতুন করে গড়ে নিয়ে। তাঁর আজন্মের সাধটি যেন সফল হবার সুযোগ পেল এতদিনে, শুধু বাড়ি বদল করেই।

অনু ভাবে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'এ বাড়ির ভাড়া কি আগের চেয়ে কম বাবা?'

'আস্তে, আস্তে,' ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে ইশারা করেন অবিনাশ, 'ভাড়া আজকাল কোথায় কম মা, আর বিনা সেলামিতেই বা ঘর কে দেয় বল্? তবে বটকেষ্টবাবু নেহাৎ—'

সময় বুঝেই যেন বটকেষ্টবাবু ঘরে ঢুকলেন। কথা অসমাপ্ত রেখে তাঁকে অভ্যর্থনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অবিনাশ।

'আরে, আসুন আসুন—একেবারে নাম করতে করতেই—কোথায় যে বসতে দি! দে তো মা অনু—

'আহা—ব্যস্ত হবেন না ব্যস্ত হবেন না, অবিনাশদা।' পাশের মোড়ার ওপর একটি পা তুলে দিয়ে বটকেষ্টবাবু বললেন, 'সব গুছিয়ে-টুছিয়ে নিন না, তখন দেখবেন বসলে আর উঠতে চাইব না—তাড়াবার জন্যেই তখন ব্যস্ত হয়ে উঠবেন।' সশব্দে

হেসে উঠলেন।

হাসলে মাড়ি বেরিয়ে পড়ে, মার্বেলের মত চোখ জোড়া গুটি পাকিয়ে আসে, অবিশ্বাস্য রকম চ্যাপ্টা দেখায় নাকটা—টিনের চেয়ারটা এগিয়ে দিচ্ছিল অনু, বটকেষ্টবাবুর মুখের ওপর চোখ পড়তে হাতটা তার আপনা থেকেই থেমে যায়।

'এটিই বুঝি আপনার কন্যা—মেয়ে? বাঃ, কি নাম তোমার?—অনু? অনুরূপা! বাঃ!'

'না, অনুপমা।'

'অ-নু-পমা! বেশ! বেশ!' পরম পরিতোষে বটকেষ্টবাবু মাথা দোলাতে লাগলেন, আবার মাড়ি বেরিয়ে পড়ল। ইচ্ছে করেও সেদিক থেকে অনু চোখ ফেরাতে পারল না।

'মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন তো দাদা? নাচগান?'

'লেখাপড়া!' স্বগতোক্তি করলেন অবিনাশ। কয়েক সেকেণ্ড থেমে বললেন, 'তা হ্যাঁ, বাড়িতেই পড়াশোনা করে। একজন মাস্টারও রেখে দিয়েছিলাম'—হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে নেন, 'তা তেমন কিছু নয়। ওর অবিশ্যি খুবই ইচ্ছে যে ম্যাটরিকটা অন্তত পাশ করে, কিন্তু ওর গর্ভধারিণী—'

বাধা দিয়ে বটকেষ্টবাবু বললেন, 'তা যাই বলুন দাদা, মেয়েমানুষ হলে কি হবে—আমি বলব বৌদির বুদ্ধি আছে। লেখাপড়া নাচগান যে খাবাপ তা বলিনা, কিন্তু যা-সব দেখছি আজকাল—ছ্যা ছ্যা! তবে সেলাইফোঁড়াই—'

'সেদিকে এসপার্ট। গাঁয়ের স্কুলের মাস্টারণীটা যা প্রশংসা করত—কি যেন তার নাম ছিলরে অনু?'

অনু জবাব দিল না, সরে গিয়ে জানালার কিনার ঘেষে দাঁড়াল—দৃষ্টি তার আকাশ-সন্ধানী। বাড়িওলাকে দেখেই কেন যে মনটা অকথ্য বিতৃষ্ণায় ভরে গেল! হয়ত আসলে লোকটা মন্দ নয়, কিন্তু হাসে কেন অমন মাড়ি বার করে? হাসলে অবিশ্যি মাস্টারদারও মাড়ি বেরিয়ে পড়ত, কিন্তু তার লেখাপড়া ছাড়ান দেয়ার কথায় কি অমন উৎসাহিত হয়ে উঠতেন মাস্টারদা? বাবাটাও যেন কি! কত ভাল মানুষ ছিলেন মায়াদি, কত ভালবাসতেন তাকে, বাবাকে জ্যাঠামশাই বলে ডাকতেন—আর তাঁকে কিনা মাস্টারণী মাস্টারণী করছেন বাবা। সত্যি কি নামটা ভুলে গেছেন মায়াদির, না হেনেস্থা করে নামটা ভুলে যাবার ভান করছেন?
জানালার রড ধরে অনু উপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। সূর্যটা কোথায়? অপরাহ্নের এক ঝলক আলো এসে পড়েছে তেতলা বাড়ির কার্ণিশে। কোনটা পূব আর কোনটা পশ্চিম বোঝার যো নেই। ওদিকে ওদের দুজনের অনর্গল কথাবার্তা—বড় অস্বস্তি বোধ করে অনু। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচে। কিন্তু যাবে কোথায়, কোথায় যাবে? ইশ্! হঠাৎ মনটা তার ব্যাকুল হয়ে ওঠে, ইশ্ একটা জানালা যদি পেত সে এই মুহূর্ত—যে-জানালা দিয়ে অন্তত দেখা যাবে এক টুকরো আকাশ আর একফালি রাজপথ!

অথচ ভাবতে গেলে অনুর নিজেরই অবাক লাগে—কলকাতায় পা দিয়ে কী ভয়টাই না সে পেয়েছিল। হাজার হাজার লোক, কিন্তু

কেউ কাউকে চেনে না, কেউ কারো নাম জানে না—সুখে দুঃখে কেউ কারো খবর নেয় না পর্যন্ত। একতলায় লোক মরছে, দোতলায় বিয়ের শাঁখ বাজল—এরকম ব্যাপারও নাকি হামেশা হয়। দেখেশুনে ভ্যাবাচ্যাকা লাগত, কেমন যেন ভয়ভয় করত।

'জানালাটা বন্ধ করে রেখেছ কেন?'

প্রথমে মাস্টারদার কথার অনু জবাব দিতে পারেনি।

'খুলে দাও।'

'থাক না—।'

'থাক! কেন?'

ভয়ে ভয়ে অনু বলেছিল, 'ভয় করে।'

'ভয়!' মাস্টারদার মত গম্ভীর মানুষও হেসে উঠেছিলেন, 'রাস্তার দিকে তাকাতেই ভয়?'

ভয় করে না মানুষের?—সবসময় পাগলের মত ছুটোছুটি করছে ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি রিক্সা-সাইকেল-ঘোড়ার গাড়ি, পায়ে হেঁটে চলেছে নানা বয়সের নানান জাতের নানান রকমের মানুষের দল, অচেনা অজানা সব—দেখে দেখে, ভয় না করুক, একটা দুর্বোধ্য আতঙ্কে গুড়গুড় করে ওঠেনা মেয়েমানুষের বুক? ধরো, হঠাৎ যদি কারো চোখ পড়ে যায় তার দিকে? কি চোখে চাইবে সে? তার সে চাউনি দেখে কি করবে অনু? কিইবা করার থাকবে তার? এক পলক তাকিয়েই লোকটা না হয় চলে যাবে, কিন্তু তার সেই চাউনিটা তো আর সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাবে না মন থেকে অনুর? সেই চাউনির কথা ভেবে ভেবে কতগুলি ঘণ্টা যে তার বিস্বাদ

হয়ে যাবে কে জানে! কিম্বা ধরো, ওই যদি হঠাৎ কোন গতিকে ওর মাঝখানে গিয়ে ছিটকে পড়ে, তারপর? ঘর থেকে জানালা দিয়ে পথের মাঝখানে গিয়ে ছিটকে পড়া অবিশ্যি অসম্ভব, কিন্তু বলা যায় কি—দুর্ঘটনার কথা কি কিছু বলা যায়? এই তো সেদিন ফুটপাথের উপর দিয়ে স্বামীর পিছু পিছু একহাত ঘোমটা টেনে চলেছিল বউটি, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ৰারেকের জন্যে অনু চলন্ত ট্রামের মাথার ডাণ্ডাটির দিকে চোখ তুলেছিল—হঠাৎ প্রচণ্ড সোরগোল। তারপর—ভাবলে এখনো দম বন্ধ হয়ে আসে—শাদা শাড়ি পরে চলেছিল যে মেয়ে, ফুটপাথের পাশেই দৈত্যের মত দোতলা বাসটির পেছনের চাকার কিনারে লালে-শাদায় ছোপান ন্যাকড়া-জড়ান মাংসের পিণ্ড হয়ে সে এখন পড়ে আছে! একটু আগে ঘোমটার আড়ালে বউটির মুখখানি দেখার বড্ড সাধ জেগেছিল—কিন্তু কোথায় মুখ—ওই নাকি মানুষের মুখ! জানালার দিকে তাকালেই যে সেই বীভৎস দৃশ্যটার কথা মনে পড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই হাত দুটো ধাক্কা দিয়ে ভেজিয়ে দেয় জানালার দুটি পাট।

অনেক ইতস্তত করে অনু দুর্ঘটনার কথাটি শুধু মাস্টারদাকে বলেছিল। দুচারদিন পরপরই এই রকম ঘটছে—জানালা খোলা রাখলেই চোখে পড়ে। তাই—

শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন মাস্টারদা। না, শুধু গম্ভীর নয়, কেমন যেন বিষণ্ণও।

খানিক চুপ করে থেকে নিজে উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে

দিয়ে এসে আস্তে আস্তে বলেছিলেন, 'অনু, যে-বাস সেদিন মানুষ চাপা দিল, মানুষই কিন্তু সেই বাস বানিয়েছে। আশ্চর্য! না?'

মাস্টারদার কথার মানে অনু বুঝতে পারেনি। অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল মাস্টারদার চোখের চশমার পুরু কাচের দিকে, তাকিয়ে তাকিয়ে তার নিজের চোখেই ধাঁধাঁ লেগে গিয়েছিল।

মাস্টারদা!

'অনু।' বারান্দা থেকে মা ডাকলেন।

ঘর ঝাঁট দেয়া ফেলে অনু উঠে এল, 'কি?'

'অপু কোথায় গেল দেখত। ওটাকে নিয়ে—'

'যাবে আর কোথায়—দেখ গিয়ে গলিতে ক্রিকেট-বল খেলছে।'

'খেলাচ্ছি ক্রিকেট-বল!' সুরমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'উনি আজ বাড়ি আসুন না!' কেটলি থেকে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'কাকে এখন পাঠাই চা দিয়ে, ভদ্রলোক মুখ ফুটে বলে গেলেন—'

'কে, বাড়িওলা?'

'চুপ চুপ, বাড়িওলা বলিসনি, শুনলে দুঃখু পাবেন।'

'তবে কি বলতে হবে—জমিদারবাবু?'

'আচ্ছা মেয়ে হয়েছিস বাপু!' সুরমা সস্নেহে ধমক দেন, 'কেন, কাকাবাবু বলতে পারিসনে? ওঁকে উনি দাদা বলেন—'

'বলেন তো বলেন!' অনু ঠোঁট ওল্টায়, 'কাকাটাকা আমি বলতে পারব না—ইঃ মাগো, যা বিতিকিচ্ছিরি মাড়ি ভদ্রলোকের!'

হাসি চেপে ধমক দেন সুরমা, 'থাম লক্ষ্মিছাড়ি। কত টাকা জানিস ওঁর ?'

'কত ? কত মা ? কত ?'

'তা কে জানে বাপু কত।' মেয়ের কথায় ঠাট্টার সুর বুঝতে পেরেও সেটাকে আমল না দিয়ে গম্ভীর ভাবে সুরমা বলেন, 'আগে ওঁদের অপিসেই নাকি কাজ করতেন। তারপর যুদ্ধের সময় ব্যবসা করে—'

'ও মা—ব্যবসা ! তাই বলো।' তাহলে ঠিকই ধরেছে অনু, ব্যবসা না করলে মানুষের চোখ অমন ক্ষুদে ক্ষুদে গোল গোল আর দাঁতের মাড়ি অমন বের-করা হয় না। তাদের গাঁয়ের ছিদাম মুদির মুখখানাও ছিল অবিকল এই রকম, সুদখোর হারাণ সা'রও। ছিদামের মুখে অবিশ্যি বেড়ালের মত গোঁফ ছিল, হারাণ ছিল এক চোখ কাণা, তুলনায় অনেক সুপুরুষ বটকেষ্টবাবু—তবু কোথায় যেন মিল আছে একটা, হুবহু মিল। হাসতে গেলে মাড়ি বেড়িয়ে পড়ে সবারই, চোখগুলো গুটিগুটি হয়ে যায়, অবিশ্বাস্য রকম চ্যাপ্টা দেখায় নাক।

'কিসের ব্যবসা মা ?'

'অতশত জানি নে বাপু। তবে হ্যাঁ—' এদিক ওদিক তাকিয়ে সুরমা স্বর নামিয়ে আনেন, তারপর কি ভেবে চেপে যান কথাটা। হাজার হলেও অনু এখনও ছেলেমানুষ, ওকে এসব কথা না বলাই ভালো।

'তুই-ই যা, চা-টা দিয়ে আয়। ও ছেলে বাড়ি ঢুকুক আগে, তারপর ওর একদিন কি আমার একদিন।'

'আ-মি পারব না।'

'এ্যাই দেখ—লজ্জা কিরে? তোর না কাকাবাবু হন।' কাকাবাবুর ওপর বিশেষ জোর দিয়ে সুরমা মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। না, মেয়ে তাঁর তেমন নয়। নইলে সেই মাস্টার ছোঁড়াটা তো একদিন ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়েই গিয়েছিল বার করে, কিন্তু কই—হয়েছে কোন ক্ষতি?

'যা মা, তাড়াতাড়ি দিয়ে আয়। নইলে আবার কি ভাববেন।'

উঁহু। অপুকে ডেকে দিচ্ছি।'

'না না, সদরের দরজায় তুই যাসনি। কে আবার ফুট কেটে বসবে—দরকার কি।'

পা বাড়িয়েছিল অনু, থমকে দাঁড়াল, 'আর বাড়িওলাকে চা দিয়ে এলে কেউ বুঝি আর কিছু বলবে না?' মুখ টিপে হাসল, 'কাকাবাবু হন কিনা!'

মুহূর্তে সর্বশরীর রাগে রী রী করে ওঠে সুরমার। অন্যায় তর্ক তিনি একেই সইতে পারেন না—তাছাড়া তাঁর পেটের সন্তান পর্যন্ত মুখে মুখে কথা কাটবে? মেয়ের ভালমন্দ কি মেয়ে বেশী বোঝে তাঁর চেয়ে? তিনি ওর পেটে জন্মেছেন না ও জন্মেছে তাঁর পেটে?

হাসিমুখেই মা'র কথাগুলি শুনে যায় অনু।

'আমার বলার ভাগ বললুম। ইচ্ছে হয় যাও, নইলে যেওনা,' সুরমা উঠে দাঁড়ালেন, 'এরপর যখন দেবে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে, বাপ-বেটিতে ঘুরো পথে পথে। আমার আর কি,' সুরমা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, 'ছেলের হাত ধরে দাদার

কাছে গিয়ে দাঁড়ালে দাদা কি আর—'

চায়ের কাপ আর পাঁপর-ভাজার ডিসটা অনু তুলে নিল।

বটকেষ্টবাবু থাকেন তিনতলায় চিলেকোঠায়। নিজের জন্যে ওই ঘরখানা মাত্র রেখে সমস্ত বাড়িটাই তিনি ভাড়া দিয়েছেন। পরিবারবর্গ নাকি দেশে থাকে—অনু শুনেছে। তেতলায় ওঠা তার এই প্রথম। এতদিন এই বাসায় এসেছে, কিন্তু তেতলায় কোনদিন ওঠেনি। সে যেন আরেক জগৎ। গুণে গুণে অনু সিঁড়ি ভাঙতে থাকে।

তেতলার সিঁড়ির মুখে পা দিতেই এক ঝলক আলো এসে মুখে লাগল। আর হাওয়ার ঝাপটা। ছাতের দরজা খোলা। অনু থমকে দাঁড়াল।

হঠাৎ আশ্চর্য এক উত্তেজনায় বুক থরথর করে উঠল। নিতান্ত অভাবিত ভাবে শোনা যাচ্ছে অতিপরিচিত একটা ঘর্ঘর শব্দ। এরোপ্লেন! চঞ্চল হয়ে উঠল অনু—এরোপ্লেন! কতদিন, কতদিন সে একটা উড়ন্ত এরোপ্লেন দেখেনি!

ছলকে উঠে খানিকটা গরম চা পা'য়ে পড়ে যায়। কিন্তু জ্বালা করে ওঠার বদলে গতিবেগই যেন বেড়ে গেল পায়ের।

ছাদ। সূর্যাস্তের কনে-দেখা-আলোয় অপরূপ আকাশ। আর সত্যি—রূপালি পাখির মত ডানাদুটি নিশ্চল করে একটি এরোপ্লেন চলেছে দিগন্ত-অভিসারে।

রক্তে যেন জোয়ার এল অনুপমার। আকাশে এরোপ্লেন দেখলেই কী যে এক উত্তেজনায় সমস্ত দেহ-মন তার আকুলি-

ঝিকুলি করে ওঠে। মাস্টারদার কথা মনে পড়ে যায়—
'অনেক, অনেক বড় এই পৃথিবী। এই প্রতিদিনকার জানা-
শোনা পরিচিত মানুষগুলিই পৃথিবীর সব মানুষ নয়—বহু বিচিত্র,
বিচিত্রতর মানুষের মেলা সারা পৃথিবী জুড়ে। পৃথিবীর অফুরান
বিস্ময়ের কি শেষ আছে'—কথার শেষে আশ্চর্য কোমল স্বরে
মাস্টারদা তার নামটি উচ্চারণ করতেন—'অনু!' কান পাতলে
এখনও যেন সে-সুর শোনা যায়! এরোপ্লেন সেই অজানা
পৃথিবীর অভিযাত্রী।
সবকিছু ছেড়েছুড়ে সে-ও যদি মুহূর্তে উধাও হয়ে যেতে পারত
ওই এরোপ্লেনের মত—নতুন নতুন পৃথিবীতে, নতুন নতুন সব
মানুষের রাজ্যে! —খাঁ খাঁ করে ওঠে অনুর মন।—'জানো, এমন
এক দেশ আছে যেখানে মেয়েরা বন্দিনী নয়, কারো চেয়ে ছোট
নয়, কারো পিছনে নয়—পৃথিবীর ছভাগের একভাগ জুড়ে আছে
সেই দেশ।'—বিদ্যুৎগতি এরোপ্লেন দেখলেই মাস্টারদার
কথাগুলি এলোমেলো ভাবে মনের মধ্যে হানা দিয়ে যায়।
এবং তার পরেই মনে পড়ে, নিজের ছোট্ট ঘর আর সংকীর্ণ
পরিবেশের ছবি—তোলপাড় করে ওঠে বুক, চৌচির হয়ে যেতে
চায়। হায়রে, সামান্য একটা জানালাও নেই তাদের ঘরে! কান্না
পায় অনুর। এইভাবে নাকি বাঁচে মানুষ, মেয়েমানুষ!
'আরে, অনুপমা যে! বাঃ!'
অনু চমকে উঠল। বটকেষ্টবাবু কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।
'দেখ দেখ, চা যেন পায়ে না পড়ে। পড়েনি তো? যাক!'
অনুর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বটকেষ্টবাবু নিশ্চিন্ত হলেন।

'কী মুশকিল, বৌদি আবার কেন কষ্ট করে—'

'না, কষ্ট আর কি।'

'বাঃ, কষ্ট নয়? যাকগে, কষ্ট না হক, কি দরকার ছিল! ঠাট্টা করে এমনি বললুম—'

'এক কাপ চা তো শুধু!'

পাঁপড়-ভাজার ডিস আর চায়ের কাপটি বটকেষ্টবাবুর হাতে তুলে দিয়ে অনু আলসের দিকে সরে দাঁড়াল।—'আপনি খেয়ে নিন, কাপটা অমিই নিয়ে যাব।' অবাক চোখে চারপাশ দেখতে লাগল। বাড়ি বাড়ি আর বাড়ি—আকাশের কিনার চোখে পড়ে না। না পড়ুক, কিন্তু কি ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে বাড়িগুলোকে। রামায়ণের গল্পে শুনেছে, কার শাপে যেন অহল্যা বলে একটি মেয়ে পাষাণ হয়ে গিয়েছিল, পাথরের ঢিবি হয়ে কাটিয়ে দিয়েছিল যুগের পর যুগ। বনের মাঝখানে একটি মাত্র পাথরের ঢিবি—পাষাণী অহল্যা। কিন্তু এখানে বন নেই, হাজার হাজার ছোটবড় বাড়ি, হাজার হাজার অহল্যা ইটকাঠ চুনসুরকি দিয়ে তৈরী বাড়িতে পরিণত। কার শাপে? কে জানে কার শাপে। এ অহল্যার শাপমোচন বুঝি আর হবেনা। আবার, ওপরে—আকাশের দিকে তাকাও—ছেঁড়া ছেঁড়া নানারঙের মেঘের দিকে তাকিয়ে ছাখো—মনে হবে রূপকথার রাজ্য যেন। আহা, রূপকথার রাজ্য! 'রূপকথার রাজ্য আকাশে নয় অনু, এই পৃথিবীতে।' রূপকথার রাজ্য পৃথিবীতে? মাস্টারদার কথায় বড় রাগ হয়েছিল। শালীনতা ছাড়িয়ে গিয়েছিল—'তবে কেন আপনারা ধর্মঘট করেছেন?

রূপকথার রাজ্যে বাস করেও পেট পুরে খেতে পাননা কেন? এ্যাদ্দিন ধরে ডাক-তার-টেলিফোন বন্ধ, সকলের এত যে অসুবিধে, কই, আপনার রূপকথার দেশের মানুষ তা—।'
কথা বলতে বলতে চোখমুখের ভাব কি অনুর খুবই কঠোর হয়ে পড়েছিল—নইলে কথার মাঝখানেই মাস্টারদা অমন স্তব্ধ হয়ে গেলেন কেন? মুখখানি কালো করে কেন উঠে গেলেন?

'চা-টা চমৎকার হয়েছে! কে করছে, তুমি? বাঃ!'

'না, মা।' মুখ না ফিরিয়েই অনু জবাব দেয়।

দক্ষিণের দিকে একটি পথের একফালি চোখে পড়ে। ট্রাম-বাস চলেনা এপথে, তবু তো পথ। পথে মানুষের ভিড়। লুঙ্গিপরা মুসলমানদের দেখা যাচ্ছে, হিন্দুদের পাশাপাশি চলেছে। মেয়েরা বেরিয়েছে, বেরিয়েছে ছোটছোট ছেলেমেয়েরাও। স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিল হয়ে গেছে হিন্দু-মুসলমানে। এই রকম মিল যে আবার হতে পারে, অনু তা আগে ভাবতেও পারত না। মাস্টারদা পারতেন—হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই। কিন্তু, মরবার সময়েও কি এই বিশ্বাস নিয়ে মরতে তিনি পেরেছিলেন? গত বছরের আগস্টের মাঝামাঝির দিনগুলি মনে পড়ে, আর মনে পড়ে এই সেদিনের পনেরোই আগস্ট রাত্রির কথা। সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারেনি—চারিদিক থেকে একতার আহ্বান উত্তাল গর্জনে ফেটে পড়ছে—নির্ঘুম বিছানায় ছটফট করতে করতে অসীম আনন্দে আর অসহ্য যন্ত্রণায় বুকটা কেবলি তার

চৌচির হয়ে যেতে চেয়েছে। এক বছর পরে সেই তো হিন্দু-মুসলমানে মিল হয়ে গেল—তবু তার চোখ উপছে উঠছে—তাঁর বিশ্বাসই তো শেষ পর্যন্ত সত্যি হল! কিন্তু তিনি কোথায়? কোথায় আজ তিনি!

'কি দেখছ?'

বটকেষ্টবাবু একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আলসের ওপরে ঝুঁকে পড়েছিল অনু, তাড়াতাড়ি সরে এল।

'হয়ে গেছে আপনার?'

'না, একটু বাকি।' অনুর বুকে চোখ রেখে আলতো ভাবে তিনি কাপে চুমুক দিলেন, 'বড্ড গরম কিনা!'

'আপনি ধীরে সুস্থে খান। অপু এসে কাপটা নিয়ে যাবে 'খন।'

'বাঃ, ইয়ে, তুমি চললে নাকি?'

'হ্যাঁ। দেরী হয়ে যাচ্ছে। মা—'

'রাগ করবেন বুঝি?'

'তা করবেন বৈকি। কতক্ষণ এসেছি।'

'ও!' হঠাৎ কথার জের খুঁজে পেলেন না বটকেষ্টবাবু। যত দেরী হক মা ওর রাগ করবে না, করলেও মুখ ফুটে বলবে না কিছু—তিনি জানেন, মেয়েটাও কি তা না বোঝে নাকি? তবু যেন কেমনতর মেয়েটা। এক চুমুকে বাকি চা'টুকু শেষ করে কাপ-ডিস অনুর হাতে তুলে দেবার সময় তার আঙুলগুলি একবার ছুঁয়ে নিয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি তার মুখের দিকে তাকালেন—বিকেলের কনে-দেখা-আলোয় কিন্তু ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে!

খবরটা দিয়েই অপু উধাও হয়ে গেল। গত ছ'রাত একেবারে ঘুমোতে পারেনি অনু, চোখছুটি একটু লেগে এসেছিল—অপুর কথায় ধড়মড় করে উঠে বসল। মিছিল! তীব্র উত্তেজনার ধাক্কায় মুহূর্তে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেল তন্দ্রার আমেজ। মিছিল বেরিয়েছে!

আবার দাঙ্গা লেগেছে, ছদিন আগে অপুই সে খবর প্রথম এনেছিল। তারপর মহাত্মাজীর অনশন, এ দাঙ্গা না থামলে তিনি প্রাণ দেবেন অনশনে। কাল দাঙ্গার প্রতিবাদে মিছিল বার করেছিল ছাত্ররা, কিন্তু কোথায় যেন হিন্দুবাই তাদের মেরে হাটিয়ে দেয়। আবার আজ মিছিল বেরিয়েছে? সব বুঝেও যেন কিছু বোঝেনা অনু।

অন্ধকার কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে তাব গত ছুটি রাত কেটেছে। দৈবাৎ চোখ লেগে এলেও 'জয় হিন্দ' 'বন্দে মাতরম' আর 'আল্লাহু আকবরের' বীভৎস আওয়াজ কেড়ে নিয়েছে চোখের ঘুম। হিংস্র কতগুলি মুখাবয়ব ভেসে উঠেছে চোখের সামনে—অচেনা অজানা সব। অবাক হয়ে অনু ভেবেছে, পনেরোই আগস্ট এরাই কি সারা রাত তাকে জাগিয়ে রেখেছিল, জাগিয়ে রেখেছিল আরেক মূর্তি ধরে? এই চার দেয়াল-ঘেরা গণ্ডির বাইরে পৃথিবীটার রূপ তাহলে কেমন? জোরালো একটা বাসনা টগবগিয়ে উঠেছে মনের মধ্যে, কি রহস্যের আলোছায়া সেখানে—যেখানে একদিন মানুষ মানুষকে ভাই বলে বুকে টেনে নেয়, আরেকদিন বিনা দ্বিধায় ছুরি বসায় সেই ভাইয়েরই বুকে? ভাবতে ভাবতে মাথার মধ্যে ভাবনাগুলি জট পাকিয়ে যেত

বলে অন্ধকার কড়িকাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে সে ভোর করে দিয়েছে দুটি রাত।

ঝড়ের মত আবার এল অপু। 'দিদি, জামাটা দেনা ভাই—শিগগীর।'

'কি করবি জামা দিয়ে?'

'মিছিলে যাব। দেখনা সদরে গিয়ে, ইশকুল-কলেজের ছেলেরা কেমন মিছিল বের করেছে, দাঙ্গা থামাবে বলে—কত্ত ছেলে! দে-না ভাই শিগগীর—'

'মা কোথায় রে?'

'জানিনে যা। জামা দিবি কিনা বল্, নইলে আমি কিন্তু গেঞ্জি গায়েই চললুম।'

হঠাৎ কঠোর স্বরে অনু বলে, 'না, তোকে যেতে হবে না।'

'বাঃ রে, আমাদের ইশকুলের সব্বাই গেল, আমি যাব না,' থতমত খেয়ে অপু বলল, 'মাস্টারমশাই যে বললেন সকলে মিলে মিছিল না করলে দাঙ্গা থামবে না আর দাঙ্গা না থামলে না খেয়ে গান্ধীজি যে মরে যাবেন! তাইতো'—গলা তার বুজে এল।

'মাস্টারমশাই।' অনু চমকে ওঠে।

'হ্যাঁ। আমাদের ইশকুলের রামপদবাবু—অঙ্কের মাস্টারমশাই!

'ও!'

দিদির মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে অপু বলে, 'ওই শোন্ দিদি, শুনছিস?

হাজার হাজার লোকের উদ্দাম কলরোল ভেসে আসছে।

'তুইও চল্ না দিদি, অ-নেক মেয়েও এসেছে—তোর মত,

তোর থেকে ছোট, বড়—'

'নাঃ। তুই একাই যা।' আস্তে আস্তে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শান্ত স্বরে অনু বলল, 'গোলমাল দেখলে কিন্তু ফিরে আসিস ভাই।' আনলা থেকে জামা নামিয়ে দিল। জামা হাতে করেই ছুটল অপু। জন-কল্লোল ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ওই সামনের রাস্তা দিয়েই হয়ত চলেছে মিছিল। গমগম করছে সমস্ত পাড়া। হাজার হাজার মানুষের মিলিত ঘোষণায় অনুর বুকটা হঠাৎ তোলপাড় করে ওঠে। দুর্বোধ্য দুরন্ত এক আহ্বানে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল, সদর দরজায় এসে দাঁড়াল।

এখান থেকে দেখা যায় না বড় রাস্তা। কিন্তু অনুভব করা যায়—একটা উন্মত্ত ঝড় বয়ে যাচ্ছে সে-রাস্তার ওপর দিয়ে। মনের চোখে তাকালে দেখা যায়—কত কীই যে দেখা যায়! অগুনতি কণ্ঠের মিলিত গর্জন—'এক হো এক হো!' ধ্বনিতে-প্রতিধ্বনিতে মুখরিত চারদিক। 'গান্ধীজীকে—বাঁচাতে হবে'—মেয়েলি কণ্ঠের শব্দতরঙ্গও মাঝে মাঝে সবকিছু ছাপিয়ে ওঠে। অপু বলছিল, অনেক মেয়েও নাকি এসেছে মিছিলে। দুর্বার আবেগের জোয়ার আসে অনুর রক্তে, দুহাতে দরজার দুই পাট ধরে সে শরীরের কাঁপন রোধ করে। একবার, অন্তত একবার যদি দেখতে পেত! নিজেকে মিছিলের একজন বলে কল্পনা করতেও ভয় হয়, কিন্তু দূর থেকেও যদি ওদের দেখতে পেত একবার! ওরা কারা, কারা ওরা—এই নৃশংস হানাহানির মধ্যেও পথে বেরিয়েছে—ওরা কারা? হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই—প্রাণ দিয়েও একথা প্রমাণ করতে পারেননি মাস্টারদা—কিন্তু কাদের কণ্ঠে আজ ঐ ঘোষণা আবার

দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে ?

রোমাঞ্চে থরথর করে সর্বশরীর। ইচ্ছে হয়, ছুটে বেরিয়ে পড়ে পথে। কিন্তু পা সরে না। সমস্ত অন্তরাত্মা হাহাকার করে ওঠে, হায়রে, একটা জানালা যদি থাকত এসময়! সামনের গলিটার দিকে অনু তাকাল—নির্জন গলি। কল্পনা করা যায় কি এই নির্জন গলিটার পেছনেই চলেছে আশ্চর্যজনক নাম-না-জানা অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা ?

অনু ছটফট করতে থাকে। বারবার অবাধ্য হয়ে উঠতে চায় পাদুটো। কিন্তু কে তাকে আজ জোর করে নিয়ে যাবে ?

'মাস্টারদা!' অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল অনু।

কোথায় মাস্টারদা ? আকাশের দিকে তাকাল অনু, গুণ্ডার হাতে মরলে কি মানুষ শহীদ হয় ? স্বর্গে যায় ?

যেখানেই থাকুন, গত বছরের সেই দিনটির মত আবার কি ঝড়ের বেগে এসে তার হাত ধরে তিনি টেনে নিয়ে যেতে পারেন না ? অনু আজ প্রস্তুত, দুয়ারে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত, কোন ওজর কোন আপত্তি সে করবে না, কারো কথা শুনবে না কারো বাধা মানবে না, পরে বাবা যদি কিছু বলেন, সব দোষ সে তুলে নেবে নিজের মাথায়, আজ আর তাঁকে অপমানিত হয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে না—কিন্তু, কোথায় মাস্টারদা ? আকাশের দিকে তাকাল অনু।

দূরে সরে যাচ্ছে মিছিল। অনুর মনে হল, চোখের সামনে থেকে হাতের কাছ থেকে কি একটা মহামূল্য সম্পদ যেন ক্রমেই নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে তার। বুকের ভেতরটা একেবারে

খালি হয়ে যাচ্ছে, নির্জন গলিটা যেন নির্জনতর হয়ে উঠছে, শ্মশানে পরিণত হচ্ছে, শূন্য—শূন্য চারদিক। এই ভয়াবহ শূন্যতার, এই গা-ছমছম নির্জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপসৃয়মান মিছিলের ধ্বনি শুনতে শুনতে তার মনে পড়ল আরেকটি দিনের দৃশ্য। গত বছরের জুলাই মাসের শেষাশেষি, গড়ের মাঠে জনসমুদ্রের মাঝখানে মাস্টারদার একটা হাত থরথর মুঠোয় ধরে বিস্ফারিত দুই চোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, শুধু দেখছিল—কি দেখছিল সেদিনও জানত না আজও জানে না। জীবনে সেই প্রথম গণ্ডির বাইরে পা দিয়েছে। দুপুরে বাড়িতে কেউ ছিল না, হঠাৎ এসে জোর করে তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন মাস্টারদা। দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল অনু, ভয় উকি দিয়েছিল মনে, তারপর সেই ভয় ছাপিয়ে জেগে উঠেছিল অপার বিস্ময়।

'দেখছ? দেখ, দেখ আমাদের শক্তি কত! সারা কলকাতার লোক এসে আজ আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

একটি মেয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিল।

'ওই মেয়েটি, ও-ও আমাদের দলে। কলকাতায় থেকেও কলকাতায় এ রূপ তুমি ভাবতে পারনা অনু, সারা পৃথিবীর—'

অনু কান খাড়া করল। আরেকটি দল যাচ্ছে। আবাব তেমনি ধ্বনিতে-প্রতিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠছে চারদিক। এরা কারা? হয়ত মিছিলেরই একটা অংশ, হয়ত পিছিয়ে পড়েছিল,—কিন্তু অনু কিছু জানেনা, কি করে জানবে অনু! মেয়েমানুষ সে, ঘরের কোণে বন্দী থেকে থেকে এ খবর সে জানবে কি করে? কলকাতায় থেকেও কলকাতাকে ও চেনে না—কান্না পায় অনুর

—আর সারা পৃথিবীর—

'কে, অনু নাকি ?'

চমকে অনু ফিরে চাইল। বটকেষ্টবাবু নেমে এসেছেন।

'যাবে নাকি মিছিলে ? চলো না, আমিও যাচ্ছি।' অনুর আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বটকেষ্টবাবু বললেন, 'ছাদ থেকে দেখলুম—বিরা-ট মিছিল। মেয়েরাও রয়েছে। যাবে ? বাঃ, এসোনা।'

অজ্ঞাতসারেই অনু চৌকাঠের বাইরে একটি পা বাড়িয়েছিল, বটকেষ্টবাবুর চোখাচোখি হতেই থেমে গেল।

এপাশ-ওপাশ দেখে নিয়ে হঠাৎ তার একটি হাত একবার মুঠো করে ধরেই ছেড়ে দিলেন বটকেষ্টবাবু।—'যাও তো এসো. আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। এসো।'

কথা শেষ করেই হনহন করে তিনি এগিয়ে চললেন।

সম্মোহিতের মত অনু তাঁর অনুসরণ করল।

ট্যাক্সিতে উঠে বটকেষ্টবাবু আড়চোখে চাইলেন বারকয়েক—কি বিশ্রী বোকাবোকা দেখাচ্ছে মেয়েটাকে! উল্টোডিঙির বাসায় এই মেয়েটিকে দেখেই কি তাঁর মাথায় প্ল্যান এসেছিল ? আবার, সেদিন বিকেলে কনে-দেখা-আলোয় এই মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়েই কি নরম হয়ে গিয়েছিল তাঁর মন ? আশ্চর্য !

জোর করে উল্টো দিকে চেয়ে রইলেন বটকেষ্টবাবু। মনে মনে হিসেব করতে লাগলেন টাকার।

ইজ্জৎ

নীলকান্তর ক্রুদ্ধ হাঁক-ডাক শুনে ধড়মড় করে শোভা উঠে বসে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দুই হাতে দুই পাট ধরে তখনও গজরাচ্ছে নীলকান্ত।

বেশি রেগে গেলে তাড়াতাড়িতে মুখ দিয়ে তার কথা সরে না। চাপা আবেগে থরথর করছে ঠোঁটদুটি, চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোচ্ছে, ঘেমে-নেয়ে-কালচে-হয়ে-যাওয়া তার অসুন্দর মুখটা অসহ্য কুৎসিত দেখাচ্ছে।

চকিতে গামছার আঁচলটা বুকে জড়িয়ে নিয়ে শোভা উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, নীলকান্ত কর্কশ গলায় বলে, 'থাক থাক, আর লজ্জায় কাজ নেই। বলি, কোমরে ওই ফালিটুকুই বা রয়েছে কেন, একেবারে মা-কালী হয়ে শুলেই হত।'

রাগে না রাগে না, কিন্তু একবার রেগে গেলে মানুষটার আর তালমাত্র জ্ঞান থাকে না। কথা বললেই এখন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়বে, অথচ মাথা হেঁট করে থাকারও জো নেই, প্রশ্নের তোড় চলবে তাহলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

তাই স্বামীকে দেখিয়ে দেখিয়ে শোভা একটু হাসবার চেষ্টা করে, তার চোখে চোখ সঁপে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু মুখে হাসির রঙ আনলে কি হবে, কী রকম ঢিপঢিপ

করছে বুকটা ! ভারী সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছিল একটু আগে, প্রাণপণে সেটাকে এখন মনে আনতে চেষ্টা করে। কিন্তু হায়রে, অমন মধুর স্বপ্নটা তার স্বামীর অতর্কিত আক্রমণে তালগোল পাকিয়ে ভয়ের একটা পিণ্ড হয়ে নিশ্বাস রোধ করে বসেছে !

মুখ ফুটে শোভা কিছু বলতে পারে না, এই অবুঝকে কোন কৈফিয়ৎ দেবার সাহস হয় না। ভাবে, আস্তে আস্তে খানিকটা উঠে দাঁড়িয়ে এক হেঁচকায় দড়ির উপর থেকে শাড়িটা টেনে নিয়ে জড়িয়ে নিলে কেমন হয়? তারপর কিছুক্ষণ রান্নাঘরে কাটিয়ে চা-হাতে হাসি-হাসি মুখে ফিরে এলে,—ইতিমধ্যে আপন মনে বক বক করতে করতে ক্লান্ত হয়ে নীলকান্তর রাগটা কি আর থিতিয়ে আসবে না ?

আস্তে আস্তে খানিকটা উঠে দাঁড়িয়ে, নীলকান্তর চোখে চোখ রেখে, হঠাৎ পাশ ফিরে এক হেঁচকায় শাড়িটা টানতে যেতেই ঘামে-ভেজা শানের উপর পিছলে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে শোভা। তক্তাপোষের কিনারে সশব্দে কপালটা তার ঠুকে যায়। থতমত খায় নীলকান্ত। রাগটা যখন পর্দায় পর্দায় চড়ে এক ধরনের হিংস্র আনন্দে মনকে আপ্লুত করে তুলেছে ঠিক সেই সময় শোভার এই অভাবনীয় নাটকীয়তায় প্রথমে সে হকচকিয়ে যায়। কয়েক সেকেণ্ড বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে, শোভা নিজে থেকে উঠে বসে কিনা দেখতে।

শোভা কিন্তু নীরব ! প্রায়-উলঙ্গ দেহটি তার অসহায়ভাবে নিথর !

তাই না দেখে মনটা হঠাৎ হু হু করে আসে নীলকান্তর। ব্যথায় বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে, যারপরনাই গ্লানিতে হৃদয় ভরে যায়। করে কি, শোভার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অতি সযত্নে মুখখানি তার তুলে ধরে। পরম স্নেহে আহত স্থানটিতে আঙুল বুলোতে বুলোতে ভাবে, আহা রে, দেখতে দেখতে কেমন নীল হয়ে ফুলে উঠল কপালের মাঝ-খানটা! তবু কী শক্ত মেয়ে ছাখ, এক ফোঁটা জল নেই চোখে! শ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ হয়ে গেল নাকি?

'শোভা! ও শোভা!' ব্যাকুল ভাবে নীলকান্ত ডাকে, 'শো—ভা!'

'উঃ!' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কঁকিয়ে কঁকিয়ে শোভা বলে, 'অ্যাঃ!'

পরের দিন সকাল।

চা খেতে খেতে নীলকান্ত প্রাণপণে প্রমাণ করতে চাইছিল যে গত দিনের অপরাধটা সম্পূর্ণ তার, এবং সেটা এত গুরুতর যে শোভা যদি ক্ষমা না করে তবে এ জীবনে শান্তি তার সুদূরপরাহত।

কিন্তু ক্ষমা করা দূরে থাক, শোভা যেন স্বামীর কথা শুনতেই গর-রাজি। সে কেবল ঘর-বার করতে থাকে নানান কাজের ছুতানাতায়।

অবশেষে অস্বস্তিতে উঠে বসে নীলকান্ত। কালকের গুরুতর অপরাধের প্রতিকারে কিছু একটা না করতে পারলে মনে তার সোয়াস্তি নেই। দরজার মুখে শোভাকে আগলে ধরে গম্ভীর স্বরে

ডাকে, 'শোভা!'
অবাক হয়ে তাকায় শোভা।—'কি? অ্যাঁ!'
'দূর পাগলি, রাগ করেছি নাকি।' শোভার গালে টোকা মেরে সোহাগ জানায় নীলকান্ত, 'এই চললুম আমি, একটা ব্যবস্থা আজ করতেই হবে। ঘরের কোণে বসে থাকলে তো আর হিল্লে হবে না—দেখি ব্যাটার ছেলে আজ কি বলে।'
শোভাও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নীলকান্ত আচমকা তাকে বুকে টেনে নিয়ে উপর্যুপরি এলোমেলো কয়েকটা চুমু দিয়ে এমন ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় যে, শোভা কথা বলবে কি, স্বামী চোখের আড়াল হয়ে গেলেও স্বামীকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বিড়বিড় করে, মানুষ তো নয়, দস্যু একটা! দস্যু দস্যু—কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান যদি এক এক বিন্দু থাকে! শাড়ির আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে হাসি-হাসি মুখে সে বিরাগ জানায় স্বামীর প্রতি।
শেতল যেন এতক্ষণ ওৎ পেতে ছিল। খানিক ইতস্তত করে এবার দরজায় উঁকি মারে।
'বৌঠান!'
'কি-ই!'
'আরে বাপ্‌রে!' দু পা পিছিয়ে তিন পা এগিয়ে এসে চৌকাঠ পেরোয় শেতল, 'একেবারে মিলিটারী যে! আঁচলটা গাছ-কোমর করে নাও বৌঠান, মানাবে ভালো।'
শেতলের প্রস্তাবের উপযুক্ত একটা জবাব শোভার মুখে এসেছিল, কিন্তু লোকটি প্রশ্রয় পেয়ে যাবে ভেবে কথাটা সে গিলে ফেলে। বলে, 'তোমার লজ্জা-সরম নেই, শেতলবাবু? সেদিন যে শুনিয়ে

শুনিয়ে অত কথা বললে, তবু কেন তুমি—'

নির্লজ্জের মত সশব্দে শেতল হেসে ওঠে, 'বৌঠানের কাছে আবার লজ্জা, ইঃ! তুমি বুঝি আমায় দেখে খুব লজ্জা পাও, অ্যাঁ?' খিক্‌খিক্ হাসিতে মুখখানি তার ভরে যায়, 'মুখ দেখে কিন্তু মোটেই তা মনে হয় না।'

'তাই নাকি!' ঝিলিক দিয়ে ওঠে শোভা, 'মুখ দেখেই মনের কথা টের পাও নাকি শেতলবাবু?'

তোমার বেলা তা পাই বই কি—সকৌতুকে শেতল হয়তো এই কথাটাই বেশ রসিয়ে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শোভার চাউনিটা যেন কেমন-কেমন মনে হয়, কৌতুক প্রবৃত্তিটা তাই চিড় খেয়ে যায়। এবং সহসা মনোমত কোন কথা খুঁজে না পেয়ে খিকখিক করে সে কেবল হাসতেই থাকে—পুরানো হাসির জের টেনে।

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছ যে বড়, কাজকম্ম নেই? দোকানে যাবে না আজ?'

'ধেত্তুরি দোকান! একটা পান দাওনা, বৌঠান।'

'পান নেই।'

'লক্ষ্মিটি বৌঠান!'

'এখন হবে না, সরো।'

'তোমার পায়ে পড়ি।'

'আ-মর!' দুপা পিছিয়ে যায় শোভা।—'কী লোক গা তুমি! পুরুষ মানুষ না?' প্রশ্নটা শোভা মন থেকেই করে, করে পুরুষ মানুষ সম্পর্কে ধারণাটা তার ভিন্ন রকম বলেই।

কিন্তু নির্বিকার শেতল তার নিজস্ব হাসির জের টেনেই বলে, 'মাইরী, বৌঠান, তোমাকে রাগলেও যা দেখায়—মাইরী !'
এরপর শোভার আর আরক্ত না হয়ে উপায় থাকে না। এবং স্বাভাবিক নিয়মে বুকটাও বারকয়েক ছলকে ওঠে ।
এটা তার অভ্যেস। গরীবের ঘরে এমন সুন্দর মেয়ে নাকি জন্মায় না—এই কথা আজন্ম সে শুনেছে মা বাবা দাদা দিদি আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শীর মুখ থেকে। পণের অভাবে বিয়ে বারবার ভেঙে গেলেও মেয়ে দেখতে এসে কিন্তু রূপের প্রশংসা না করে যো থাকত না কারুরই। সেজেগুজে নতুন নতুন পাত্রপক্ষের কাছে দাঁড়াতে কি ভালোই যে লাগত তার! প্রত্যেকবার সম্বন্ধ ভাঙার পর মা'র কাছ থেকে বাঁকা বাঁকা কথা শুনতে শুনতেও শোভা প্রার্থনা জানাত, বিয়ে যেন তার কোনদিন না হয়—হেই ভগবান! নতুন নতুন পাত্রপক্ষের সামনে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই বিয়ের বয়স যেন পেরিয়ে যায়! নিজের রূপ সম্বন্ধে সে সচেতন, মাত্রাতিরিক্ত সচেতন, রূপের অহমিকা তার অপরিমেয়।
'এই বসলুম গ্যাট হয়ে। পান না খেয়ে উঠছিনি বাবা।'
সত্যি সত্যি যে লোকটা তক্তাপোষের ওপর বসে পড়ল!—'খুব যে সাহস দেখছি? এখ্খুনি যদি ফিরে আসে?'
'সে গুড়ে বালি! সব শুনিছি আমি—কাপড়ের লাইনে একবার দাঁড়ালে তিনটি ঘণ্টার ধাক্কা।'
'কাপড়ের দোকানে কাজ করো বলে যে বড্ড দেমাক তোমার!'
পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শোভা বলে, 'তা, এত তো আপনার লোক

তুমি, কিন্তু এই যে ছেঁড়া তেনা পরে কাটাচ্ছি, কই, হেলাফেলা করেও তো একটা আটহাতি শাড়ি এনে দেবার গরজ দেখি না।' চোখ কোঁচকায় শোভা, 'দামটা না হয় আগামই নিয়ে রাখতে, বিশ্বেস না হয়।'

'সত্যি! মাইরী শাড়ি চাই তোমার?' টান হয় বসে শেতল।

'থাক, আর ন্যাকা সেজে কাজ নেই! কাল এটায় সাবান দিয়ে দুপুরে একটুখন গামছা পরেছিলুম বলে—' কথার মাঝখানে শোভা থেমে যায়, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এতখানি আত্মীয়তা ভালো নয়। ভারী তো আপনার জন, পাশাপাশি ভাড়াটে, এই যা। মা মাগীটা তো দুচোখে তাকে দেখতে পারে না, দুবেলা গাল না দিলে মাগীর যেন মুখ শুদ্ধ হয় না। সে-ই নাকি তার অমন সোনার চাঁদ ছেলেটার মাথা খাচ্ছে! সোনার চাঁদ! মনে মনে হাসে শোভা। সোনার চাঁদই বটে! দাঁত-ফোকলা ওই কেলে-কিস্কিন্ধিটারই তো গভ্যের সন্তান— কি আর নবকাত্তিক হবে! একটু নাই দিলে এঁটো পাতাও চাটতে পারে এই সোনার চাঁদ! দেখাবে নাকি মাগীকে মজাটা?

একটা জোরালো চাপা মতলব শোভার মনে ঘাই মারে।

'মা কোথায় গো?'

'গঙ্গা নাইতে গেছে—এক্কেবারে সেই গিয়ে কালিঘাট!'

'তাই এত আস্পদ্দা!'

'ইস্, ভারী তো ভয়!'

'নেই বুঝি?'

'মোট্টেও না। কিন্তুক ও কথা ছাড়ান দাও—সত্যি তোমার

শাড়ি চাই বৌঠান ?'

'কেন, কি হবে তাহলে ? শাড়ির রাজ্যি একেবারে জয় করে আনবে ?' মুখ টিপে হাসলে ভারী চমৎকার টোল খায় শোভার গাল, শোভা জানে।

'দয়া করে শুধু একবার মুখের কথাটি খসাও, ত্মাখোনা কখানা ফাস্টো কেলাস—মিলের চাও মিলের, তাঁতের চাও তাঁতের—'

'তাই নাকি !' শোভার হাসি এবার নিভে যায়, কিন্তু চোখজোড়া ঝিকিয়ে ওঠে, 'পেরাইভেট ব্যাবসাও চলে বুঝি ? মালিক একদিন দেখতে পেলে'—

'কি যে বলো, শোভারাণী ! তোমার তরে মাইরী'—

গদগদ-ভাবে উঠে দাঁড়াচ্ছিল শেতল, চকিতে দু'হাত পিছিয়ে গিয়ে অস্বাভাবিক কর্কশকণ্ঠে শোভা চেঁচিয়ে ওঠে, 'কে চায় আপনার শাড়ি ? যান,—যান আপনি এঘর থেকে। গেলেন'—

'কি ব্যাপার ?' ফ্যালফ্যাল করে শেতল চেয়ে থাকে, 'হল কি ? বলি হঠাৎ অমন ক্ষেপে উঠলে কেন ? আমি তো বৌঠান'—

'বৌঠান !' একপদা চড়ে যায় শোভার স্বর।—'এখনো তুমি দাঁড়িয়ে আছ শেতল বাবু ? বেশ, থাকো তুমি।'

শেতলকে বোকা বানিয়ে রেখে শোভা নিজেই তরতর করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এবং ঘরের মাঝখানে কিছুক্ষণ থ' মেরে দাঁড়িয়ে থেকে শেতলও পেছন ফেরে। বিতিকিচ্ছিরি ভাবে মনটা তার বিষিয়ে যায়—গেরস্ত বউ নিয়ে এই এক হ্যাফাজত। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। এর চেয়ে হাফ-গেরস্ত অন্নদা-মোক্ষদাই ভালো—ফেল কড়ি,

মাখো তেল। কিন্তুক, কী যে শখ নন্দী মশায়ের—কাপড়ের কারবারে বুদ্ধি আর কত খোলসা হবে? আসলে তো বাবা সবই সমান, গেরস্তই কি হাফ-গেরস্তই কি!

এদিকে রান্নাঘরে দুচোখ ফেটে জল আসছে শোভার। একটু বেসামাল হলেই কি যে-সে তাকে অপমান করে যাবে? একটু হেসে কথা বলেছে কি অমনি যা-তা ভেবে বসবে তার সম্পর্কে? কেন এত ছোট হয় মানুষের মন? সে যে একজনের অগ্নিসাক্ষী করা মন্ত্রপড়া বউ—একথা কেন মানুষ বোঝে না! জেনেও কেন ভুলে যায়! প্রচণ্ড একটা অভিযোগ পাক খেয়ে খেয়ে শোভার বুক ঠেলে উঠতে থাকে। কেন স্বামী সব সময় তাকে ঘিরে থাকে না? ইস, নীলকান্ত যদি এখন থাকত! কখন, কতক্ষণে ফিরবে সে?

নীলকান্ত ফিরল ঘড়ির কাঁটা বারোটা পেরোতে, শ্রান্তক্লান্ত দেহে। শোভা তখনও রান্নাঘরে বসে। গলদঘর্ম।

'হল না! মিছিমিছি এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলে!' তক্তাপোষের ওপর এলিয়ে পড়ে নীলকান্ত।

'থাক গে। আরেক দিন গেলেই হবে।' পাখা করতে করতে শোভা বলে, 'সেলাই-টেলাই করে আর কটা দিন চালিয়ে নেব খন।'

'আর আরেকদিন! বললে, ফের কবে চালান আসে তার ঠিক নেই!' ক্লান্তশ্বাস ফেলে নীলকান্ত, 'বুঝলে, শালারা মহা হারামজাদা। কাপড় তোর কম আছে, আগেভাগে বল্—তা না, এই কাঠফাটা রোদ্দুরে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে—'

শোভার হাতপাখা ঘনঘন চলে। নীলকান্তর মুখ একেবারে

কালিবর্ণ হয়ে গেছে। ধুলোয় আর ঘামে চটচট করছে মুখমণ্ডল, কপালে ঘাড়ে গলায় বিজবিজে অগুনতি ঘামাচি, জামাটা লেপটে গেছে দেহের সঙ্গে।

'চুপচাপ খানিক জিরিয়ে নাও, বাতাস করি। আবার তো আপিস আছে।'

'পাগল! ছুটোর সময় আপিস গেলে গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে না! সদ্বুদ্ধি তো আর একটা নয়! তার চেয়ে কাটুক শালারা একদিনের মাইনে।'

'তাই ভালো!'

'তোমার তো সবতাতেই ভালো!' খিঁচিয়ে ওঠে নীলকান্ত। তারপর চোখ বুজে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থাকে। যান্ত্রিক গতিতে দোল খায় শোভার হাত-পাখা।

'ছেঁড়া-খোঁড়া—একখানাও নেই, না? বাক্স-প্যাঁটরা ভালো করে খুঁজে দেখেছিলে? কাঁথার বোঁচকাটা?'

বিষণ্ণ হাসল শোভা, 'ছিল বিয়ের বেনারসী আর রাঙা মাসীমার দেয়া সেই সিল্কের শাড়িখানা। তাও তো শালকরকে দিয়ে—'

'তখন কি আর জানতুম ছাই যে, অমন দাঙ্গা বাধবে! সময় বুঝে একেবারে তেরস্পর্শ যোগ লেগেছে।'

'না না, তোমার আর কি দোষ। সত্যি তো, তুমিই কি আর জানতে!'

একটু পরে কি ভেবে নীলকান্ত উঠে বসে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোভার পরণের শাড়িটা পরীক্ষা করে বলে, 'এটাই যা একটু ভালো আছে, না?'

শোভা সায় দেয়।

'কিন্তু, এ আর কদিন!' হতাশভাবে আবার গা এলিয়ে দেয় নীলকান্ত। চোখ বুজেই এক সময় টেনে টেনে বলতে থাকে, 'কি আশ্চর্য দেখ, ওই বুড়ি মাগীটা কেমন আনকোরা থান পরে ঘুরে বেড়ায়! ওর নেংটো থাকলেই বা ক্ষতি কি, অ্যাঁ!'

'আঃ, আস্তে'—

'রাস্তাঘাটে দেখি, একেকটা ছুঁড়ির ব্লাউজ খুললেও ব্যাটাছেলে কি মেয়েছেলে বোঝার জো নেই, ইদিকে শাড়ির কী বাহার!'

শোভা এবার ধমক দেয়, 'ভারী অসভ্যের মত কথা বলছ বাপু। মানুষের থাকলে পরবে না কেন, এও তো অন্যায়!'

'মানুষের থাকলে!' নীলকান্ত চাপা গর্জন করে ওঠে, 'কিন্তু আমি কি মানুষ নই? তা'লে আমার থাকবে না কেন? টাকা দিয়েও কেন আমি শাড়ি কিনতে পাব না? সোমত্ত বয়েস তোমার, অনেকের চেয়ে কত সুন্দর তুমি—কেন তুমি গামছা-তেনা পরে কাটাবে? কেন? জবাব দাও?' আকস্মিক উত্তেজনায় নীলকান্ত উঠে বসে।

জবাব! কি জবাব দেবে সে? শোভার মনে হল এই প্রশ্নের জবাব একটা নিশ্চয় আছে, কিন্তু তার স্বামী যা জানে না, নিতান্ত মেয়েমানুষ হয়ে সে তার কি জানবে? তাছাড়া, নীলকান্তর প্রশ্ন কি শুধু একটা প্রশ্নই, অমন উত্তেজিত দেখাচ্ছে কেন ওকে? শোভার নিজেরই কেমন ভয় ভয় করতে থাকে রাগে না রাগে না, কিন্তু একবার রেগে গেলে মানুষটার আর তালমাত্রা জ্ঞান থাকে না! এ রাগের হেতু হয় তো সে নয়, তবু রাগ

চণ্ডাল—তাকে বিশ্বাস কি? —'জল খাবে, জল? দাঁড়াও, নিয়াসি।'

চেনাশুনো সব জায়গাতেই ঢুঁ মারল নীলকান্ত। কিন্তু সর্বত্র ঐ এক কথা: কাপড়! এখনো নতুন লাট আসেনি, মশাই। কবে আসবে? যেদিন কর্তাদের মর্জি!

একেই চারদিক থেকে ধারে কর্জে ডুবে আছে, চারগুণ দাম দিয়ে যে তাঁতের শাড়ি কিনবে সে-ক্ষমতা নেই। এদিকে পরনের শেলাই-করা তেনাটাও দিনকে দিন ফালি ফালি হয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে নীলকান্ত হাল ছেড়ে দিল।

'পারলুম না—নাঃ!'

'কি করবে বল চেষ্টার তো আর অন্ত রাখনি।' স্বামীর গা ঘেঁষে বসে শোভা। সত্যি, চেষ্টার কিছু বাকি রাখেনি মানুষটা—শরীরের দিকে চাইলেই বোঝা যায়। একেই আপিসের হাড়-ভাঙা খাটুনি, তার ওপর এই ঘোরাঘুরি—এ ক'দিনেই যেন আধখানা হয়ে গেছে। বড় মায়া হয় শোভার, মনটা টনটন করে ওঠে। কিন্তু কী বলেই বা সান্ত্বনা দেবে! করবেই বা কি, অবলা নারী বইতো কিছু নয় সে! তাই শোভা করল কি, নীলকান্তর ঘাড় থেকে ডাঁসা ডাঁসা ঘামাচিগুলি বেছে বেছে সস্নেহে পিট পিট করে মেরে দিতে লাগল।

'বাড়িটা বদলাতে পারলেও হত। হারামজাদাটা সব সময় যেন তোমায় গিলে খেতে চায়।'

'ছোটলোকদের কথা বাদ দাও।'

'শুধু ছোটলোক? একেবারে হাড়-হারামজাদা!' নীলকান্তর

ছুই চোয়াল রী রী করে ওঠে।

পর মুহূর্তেই ঝুঁকে পড়ে থুতনিটা। বিষাদ-গভীর স্বরে বলে, 'তুমিও যে কেন ওই কেল্টটার মত হলে না! তাহলে গা উদুল করে ঘুরে বেড়ালেও কেউ ফিরে চাইত না।'

বুকটা ছলাৎ করে উঠছিল শোভার, কিন্তু এখন বুক-ছলাৎ-করে-ওঠার সময় নয়।

'আমার আর কি হাত বলো—সবই তো ভগবানের দান।' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শোভা বলে, 'আর জন্মে নিশ্চয় কোন পাপ করেছিলুম, তাই এই শাস্তি। নইলে ঘরে ঘরে মা শেতলার এত দয়া হয়, আমারো যদি'—কথা শেষ না করে ছল ছল চোখে তাকায় নীলকান্তর দিকে—প্রতিবাদের প্রত্যাশায়।

নীলকান্ত নির্বিকার। বউ-এর কোন কথাতেই যেন তার কান নেই। আরও খানিক ঝিম মেরে থেকে বলে, 'শোনো, এক কাজ করো দিকিন—যতক্ষণ ওই হারামজাদাটা বাড়ি থাকে, তুমি ঘর থেকে বেরিও না।'

'বেরুই না তো।'

'তবে তুমি ওকে পানটান দাও বলে বুড়িটা যে সেদিন'—

স্বামীর মুখ থেকে কথাটা ছিনিয়ে নেয় শোভা, 'ওসব পুরনো কাসুন্দি। মানুষ চেনার পর থেকে সাবধান হয়ে গেছি।'

'হ্যাঁ, খুব সাবধান।' নীলকান্ত হুঁশিয়ারী জারী করে, 'ওটা যে একটা লম্পট—চোখ মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়। তোমায় বেআবরু দেখলে কি করে বসে তার ঠিক নেই।' শোভার

দিকে এক নাগাড়ে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে হঠাৎ কি হল—ছেঁড়া-তেনায়-ঢাকা-না-পড়া বউয়ের সুপুষ্ট দেহটাকে নীলকান্ত এক হেঁচকায় বুকে টেনে নেয়। কিন্তু সোমত্ত বউকে বুকে টেনে নিলে যে-রোমাঞ্চে থরথরিয়ে ওঠে যোয়ান মানুষের দেহ-মন, নীলকান্তর মধ্যে তার কিছুরই হদিশ নেই। শোভাকে প্রাণপণ শক্তিতে বুকে চেপে ধরেও নীলকান্তর মনটা তৃতীয় ব্যক্তি হয়ে কেবলি ভাবতে থাকে, কেন এত নরম আর নিটোল ওর শরীর? কেন এত ফর্সা রঙ, আর আয়ত চোখ, আর টিকলো নাক? কেন এই অজস্র চুলের বাহার? কেন? কেন?
বারবার আজ, বিয়ের পর এই প্রথম, উপরোক্ত প্রশ্নগুলি একযোগে নীলকান্তর মনে এসে হানা দিতে লাগল বলেই হয়তো নিজের যারপরনাই কুৎসিত দেহটি দিয়ে শোভার সর্বাঙ্গের অসহ্য সৌন্দর্যের চেকনাইকে সে ম্লান করে দিতে চাইল।

বিকেলে নীলকান্ত বেরুচ্ছে, দরজার কাছে একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল শেতলের সঙ্গে। দেখিনি দেখিনি করে নীলকান্ত পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, শেতল নিজে থেকেই ডাকে।
'নীলুদা।'
'কী?' চোখে মুখে একরাশ বিরক্তি এনে নীলকান্ত ঘুরে দাঁড়ায়।
'বলছিলুম কি'—নীলকান্তর দিকে তাকিয়ে পরপর কয়েকটা ঢোঁক গেলে শেতল। তারপর এপাশ-ওপাশ দেখে নিয়ে প্রায় ফিসফিস স্বরে বলে, 'শাড়ি চাই নীলুদা, শাড়ি? বলো তো

আমার দোকান থেকে'—

চড়াক করে ওঠে নীলকান্ত, 'তোমার দোকান? তা দোকান কোথায় দিলে শেতল, হগ সাহেবের বাজারে নাকি?'

শেতল অপ্রস্তুত হাসে, 'কি যে বলে, নীলুদা! নিজে দোকান দেবার ভাগ্যি কি আর করিছি। তা নয়, যেখেনে চাকরী করি'—

'তা বেশ করো। কিন্তু আমার পরিবারের শাড়ি চাই কি শেমিজ চাই কি বডিজ চাই—তার খবর তুমি পেলে কোথায়? সে খবরে তোমার দরকারই বা কি, অঁ্যা? উপগার করতে চাও? কিহে, অমন বুম মেরে গেলে কেন, মুখটাই না হয় খোল দয়া করে!'

উত্তর দেবে কি, নীলকান্তর চড়া গলার উপর্যুপরি প্রশ্নে শেতল রীতিমত ঘাবড়ে যায়। কি বলবে, মানে কি বলা উচিত, বললে মানায়ও—হদিশ পায় না। শোভার কাছ থেকে জেনেছে—একথা কি মুখ ফুটে বলা যায় এমন গোঁয়ারগোবিন্দর কাছে? আবার নিজেই আগবাড়িয়ে খবর নিয়েছে—একথাটা বললেই বা অবস্থাটা এরপর দাঁড়ায় কেমন? নন্দী মশায়ের ওপর অকথ্য রাগে শেতলের সর্বশরীরে জ্বালা ধরে যায়।

কিন্তু নীলকান্ত লোক বিবেচক। শেতলের জবাবের প্রত্যাশায় সে দাঁড়িয়ে থাকে না, তবে বেরিয়ে যাবার বদলে আবার হনহন করে বাড়ির ভেতর ঢোকে। এবং সাতপাঁচ ভেবে শেতল আর বাড়িতে ঢোকে না, হনহন করে বেরিয়ে যায়।

দরজা আবজে শোভা উনোনে আঁচ দিচ্ছিল, কোমরে এক

ফালি গামছা। ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার ঘর, অসহ্য গুমোট, আর এরি মধ্যে উবু হয়ে বসে উনোনের মুখে সে বাতাস করছে।

'শুনছ?'

'উঁ।' শোভা চমকে ওঠে, 'ফিরে এলে যে?' দুই হাঁটুর মধ্যে শরীরটাকে যথাসম্ভব কুঁকড়ে এনে শুধু মুখটুকু উঁচিয়ে বলে, 'ঘরে গিয়ে বসো না, আমি আসছি।'

সে কথায় কানই দেয় না নীলকান্ত। ধোঁয়ান্ধকার খুপরির মধ্যেই একদৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে বউয়ের দিকে। আছে তো আছেই।

ওদিকে বাতাস-করা শোভার বন্ধ হয়ে গেছে। বারবার সে আড়চোখে চাইতে চেষ্টা করে, আর স্বামীর শরীরী অস্তিত্বটা অনুভব করে ক্রমেই যেন সিঁটকে আসে তার শরীর।

'কী এই ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ!' শোভা এবার গৃহিণী-সুলভ ধমক দেয়, 'ঘরে যাও না বাপু, বললুম তো আসছি।'

'হ্যাঁ এসো! খু-ব সেজেগুজে এসো!' বিযাক্ত কণ্ঠে নীলকান্ত বলে, 'সাজলে-গুজলে তবু যদি তাকান যায়'—

কুঁকড়ে-যাওয়া অবস্থাতেই গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে উঠেছিল শোভা, কিন্তু তার কোন অবসরই পেল না।

চৌকাঠের বাইরে নীলকান্তর কণ্ঠ তখনও বিষ ঝরিয়ে চলেছে, 'শরীরে খাবলা-খাবলা মাংস থাকলে আর গায়ের রঙটা শাদা হলেই যদি সুন্দর হোতো, তাহলে তো বকনা গরুই সেরা সুন্দরী! হুঁঃ! সাজগোজের ভড়ং না থাকলে আবার মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ! থুঃ! থুঃ!'

দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে নীলকান্তর ভারী পদশব্দ। কিন্তু স্বামীর মুখখানি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শোভা—তীব্র বিতৃষ্ণায় মাড়ি-বের-করা অনেক-দিন-দাড়ি-না-কামানো মুখটা তার আরো কুৎসিত হ'য়ে উঠেছে। এই সেদিনও তার নগ্ন দেহের দিকে তাকিয়ে মার্বেলের মত যে চোখজোড়া দুরন্ত কামনার আগুনে ঝকঝক করে উঠেছে,—ঘৃণা ঝরছে এখন সেখানে থেকে! পরশুও তার দেহটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্যে যে বাহুদুটি আকুলি-বিকুলি করে উঠেছিল—অসহ্য বিতৃষ্ণায় তা এখন নেতিয়ে পড়েছে দু'পাশে!

শোভা নিজেকে তুলে ধরল। ধোঁয়ায় যেন এবার সত্যি সত্যিই দম তার বন্ধ হয়ে আসবে।

খানিকটা ফাঁকা জায়গা দরকার, দরকার আলো আর হাওয়া। আলো আর হাওয়া দরকার শোভারাণীর!

গল্পের নায়িকাদের রেওয়াজ মাফিক এর পর শোভার মত মেয়ের পক্ষে স্বামীর বিরুদ্ধে গভীরতর কোন ষড়যন্ত্র গড়ে তোলাই হয়তো স্বাভাবিক হত, কিম্বা হয়তো এমন কিছু করে বসাও আশ্চর্য ছিল না সাহিত্যিক ভাষায় যাকে বলা হয় 'সিনক্রিয়েট'। কিন্তু শোভা সে সব কিছুই করল না—প্রকাশ্যে কিছুই না। বরং পরদিন নীলকান্ত অফিস থেকে ফিরতেই স্মিতহাস্যে তাকে সম্বর্ধনা জানাল। দিনভোর যেন সে এই মুহূর্তটিরই প্রতীক্ষা করছিল।

'ভারী একটা সুখবর আছে।

'কী?'

'বলো, আগে কি দেবে?'

'ভণিতা ছাড়ো। সোজাসুজি বলবে তো বলো।'

'যাও, বলব না! বাড়িতে পা দিয়েই মেজাজ ছাখোনা!'

'না বললে তো বয়েই গেল।' নীলকান্ত চুপচাপ আপিসের জামা-কাপড় ছাড়তে লাগল।

অভিমান করে শোভা প্রতীক্ষায় থাকে। স্বামীর কৌতূহলের কথা সে জানে। এখুনি নিজে থেকেই জানতে চাইবে, কথাটা বলার জন্য সাধাসাধি করবে, না শোনা পর্যন্ত স্বস্তি থাকবে না তার। বলা যায় কি, তেমন শক্ত থাকতে পারলে, হাতে পায়ে ধরতেও হয় তো কসুর করবে না।

কিন্তু আজ নীলকান্ত নট নড়ন-চড়ন। জামা-কাপড় ছাড়া হলে বিছানায় গিয়ে সে সটান শুয়ে পড়ে, এক হাতে চোখ ঢেকে অন্য হাতে নিজেই পাখা চালাতে থাকে।

উসখুস করে শোভা, 'শুনলে না তো? যাকগে!'

'কান খোলাই আছে, বললেই শুনি।'

অন্যদিন হলে এরকম ঠেসমারা কথার পর শোভা নির্ঘাৎ আরো বেশি অভিমান করত, দুচোখ ভরে জল আনত, ছিটকে বেরিয়ে যেত ঘর থেকে, শত ডাকেও আর সাড়া দিত না সহজে। কিন্তু কাল বিকেলের অভিজ্ঞতা তার মনকে জানিয়ে দিয়েছে এরপরও আজ অভিমান করে থাকলে মান থাকবে না সেই অভিমানের। এবং সোয়ামীর কাছে যদি বউ-এর

অভিমানের মানই না রইল তবে ধিক তার নারীজীবনে !
আচমকা শোভার ভেতরে যেন পতিপ্রেমের বন্যা আসে। ষোল আনা অপরাধ নীলকান্তর জেনে-শুনেও তাকে ক্ষমা করার অসীম উদারতায় পেয়ে বসে। পাশে বসে স্বামীর বুকে সস্নেহে হাত বুলোতে শুরু করে।
'অমন করে চোখ বুজে শুয়ে থাকলে কিন্তু ভালো হবে না বলছি, হুঁ !'
'বেশ, তাকাচ্ছি।'
'শুনবে না তো ?'
'আমি কি না বলেছি ?'
'আমিই কি বলব না বলেছি ? তোমার মুখ দেখেই তো সাহস হচ্ছে না।'
'তা তো বলবেই ! সারাদিন যে আপিসে কি হুজ্জোত পোয়াতে হয় তা যদি জানতে ! বড়বাবু শালা'—
'চুলোয় যাক তোমার বড়বাবু। যারা মানুষকে এত কষ্ট দেয় তাদের মরণ হয় না কেন তাই ভাবি।'
'ওই কথাটি বল না। এতো তবু ভালো, এ মরলে ছোটটা যদি বড় হয় তো আরো সর্বনাশ। যাকগে, কি যেন বলবে বলছিলে—?' শোভার একটা হাত নীলকান্ত মুঠো করে ধরে।
হাতের চাপে কয়েক মুহূর্ত স্বামী-সঙ্গের শিহরণ উপভোগ করে শোভা বলে, 'তোমারই বাপু বাহাদুরী সেদিন অত করে বললে কাঁথার বোঁচকাটা দেখতে, ভালো করে দেখলুম না। কিন্তু আজ দেখি কি'—

'কী ?'

'দেখিকি, ওর মধ্যে একখানা শাড়ি—তাঁতের ডুরে'—

'অ্যা।' তড়াক করে উঠে বসে নীলকান্ত, 'সত্যি বলছ ? মা কালীর দিব্যি ?'

'না, আমি সত্যি বলব কেন ! আমি তো একটা মিথ্যেবাদীই !'

'ধ্যেৎ, ভারী ছেলেমানুষ তুমি !' সপ্রেমে বউকে কাছে টেনে আনে নীলকান্ত, 'জানো, এই শাড়ি শাড়ি করেই না মেজাজ আমার তিরিক্ষি হয়ে আছে। নইলে কোনদিন তোমায় দুঃখু দিয়েছি, বলো ?'

'না, তাকি আর দিয়েছ ! এই কদিন ধরে'—

'দূর পাগলি !' বউ-এর গালে খামচি মেরে আদর জানায় নীলকান্ত, 'কই, দেখি কেমন শাড়ি ? ডুরে শাড়ি তোমায় যা মানাবে, শোভু !'

'থাক আব সোহাগে কাজ নেই !

'উ তা বইকি !' বউকে সবেগে বুকে টেনে নিয়ে ভয়ানক রকম সোহাগই হয়ত জানাতে যাচ্ছিল নীলকান্ত, নিজেকে মুক্ত করে শোভা উঠে দাঁড়ায়।—'হয়েছে, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই ! এখন শিগ্‌গীর যাও, গা-হাত-পা ধুয়ে এসো।'

'বেশ, এসেই দেখব তুমি ওই শাড়িটা পরে আছ, বলো ? আচ্ছা, এক কাজ করোনা, একটু সেজেগুজেও নিও না—বাড়িতে আর চা খাবো না, ট্রামে করে দুজনে বেড়িয়ে আসব, আর সে-ই দোকানটায় চা খাব ? অ্যা, কেমন ?'

'ভারী ফুর্তি, না ?'

'লক্ষ্মিটি, যা বললুম ক'রো কিন্তু, আমি এই যাব আর আসব—পনেরো মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে নেয়া চাই।' গামছাটা কাঁধে ফেলে নীলকান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

গা ধুয়ে এসে নীলকান্ত শোভাকে ঘরে দেখল না। মিনিট কয়েক পরে শোভা যখন এল, সে চুল আঁচড়াচ্ছে।

'এই শরবৎটুকু খেয়ে নাও। শরীরটা একটু ঠাণ্ডা হোক। তেতে-পুড়ে এসেই তো আবার বেড়াবার বাই চাপল।'

আশ্চর্য মানিয়েছে শোভাকে। চুল আঁচড়ানো ভুলে গিয়ে নীলকান্ত মুগ্ধদৃষ্টিতে অপলক চেয়ে থাকে। এরি মধ্যে জরির বিনুনী দুলিয়েছে, খয়েরের টিপ পরেছে, কোন প্রসাধনই বাদ যায়নি। আর তনুদেহটিকে তার সাপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেষ্টন করে ধরেছে ডুরেকাটা একটা শাড়ি। আধখানা ঘোমটার মধ্যিখানে টলমল করছে প্রতিমার মত মনোরম মুখখানি।

'নাও।'

হাত থেকে শরবতের গেলাস নিয়ে নীলকান্ত নামিয়ে রাখে। তারপর গভীর আবেশে শোভাকে জড়িয়ে ধরে। স্বামীর কাঁধে গাল রেখে নিজেকে সঁপে দেয় শোভা।

নীলকান্তর ইচ্ছে হল, আরো কিছুক্ষণ—অনেকক্ষণ—শোভাকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেখে। সামান্য একটা ডুরে শাড়ির কী এমন ক্ষমতা যে যুবতী বউকে এমন অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর করে তোলে যার ফলে মদির মুহূর্তে তোকে বুকে চেপেও স্বামীর সমস্ত উত্তেজনা ধাপে ধাপে চড়ার বদলি ক্রমেই সম্মোহিত হয়ে আসে? শোভার ঘাড়ে কেবলই নাক ঘসতে থাকে নীলকান্ত।

হঠাৎ কাঁধের কাছটা শিরশির করে ওঠে, কোরা তাঁতের সুতোর উগ্র মোহময় গন্ধ !

একবার দপ করে উঠেই মাথা ঝিমঝিম করে আসে।

যেন ভীষণ ঘুম পাচ্ছে নীলকান্তর, ক্রমেই যেন চোখদুটি তার জড়িয়ে আসছে কড়কড়ে নতুন শাড়ির খস-খসানির রোমাঞ্চকর আওয়াজ শুনতে শুনতে।

স্বপ্নাচ্ছন্ন দুই চোখ মেলে বউয়ের মুখখানি নীলকান্ত একবার দেখতে যাচ্ছিল, হঠাৎ জানালার দিকে চোখ পড়তেই ছিটকে সরে গেল।

'কি হল ?'

'শেতল।'

'তাতে কি হয়েছে ?' ভালো করে ছিটকিনিটা বন্ধ করার জন্যেই হয়তো জানালার কাছে এগিয়ে যায় শোভা।

কিন্তু, কাজটা কি ভালো হচ্ছে, নীলকান্ত ভাবল। লোকটা হয়তো উঁকি দিয়েছিল কোন প্রয়োজনে, পান-টান খেতে বড্ড ভালবাসে,—হয়তো বা সেই কারণেই। কিন্তু একি ব্যবহার শোভার ? তার কি উচিত নয় ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শেতলের প্রয়োজনটা অন্তত জেনে নেয়া, দরকার হ'লে ঘরে এনে সমাদর করে বসানো ? দরকার হলে ঘর থেকে না হয় বেরিয়েই যাবে নীলকান্ত !

তার মানুষ চিনতে ভুল হয় বলে কি শোভাও ভুল করবে ?

কি যেন বলতে যায় নীলকান্ত, গলা দিয়ে তার স্বর ফুটল না !

অমিত্রাক্ষর

সকালে ঘুম থেকে উঠেই মিনু জিজ্ঞেস করল, 'বাপি আজ আসবে, না মা?'

আশ্চর্য! ঘুম ভেঙেছে ঘণ্টাখানেক আগে, কিন্তু একবারও এ কথাটা মনে হয়নি উমার!

অথচ উমা যে জানত না তা নয়, দেড় বছর আগে থেকেই এই দিনটি তার জানা, দিনের পর দিন এই দিনটির কথা মনে পড়েছে, দিন যত ঘনিয়ে এসেছে উত্তেজনা বেড়েছে তত—সে-উত্তেজনা পুরো আনন্দেরও নয় আশঙ্কারও নয়—আনন্দ-আশঙ্কা-মেশানো দুর্বোধ্য অকথ্য এক উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে ভেতরে ভেতরে। কি করবে কি করা উচিত, ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারা পায়নি। জীবনের জটিলতম সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে প্রশ্নটা।

কাল বিকেলে হাবুলরা এসেছিল, জেলগেটে ভূপেনকে অভ্যর্থনা জানাবার কাজে উমাকেও তাদের সাথী হতে বলেছিল—এক কাপ করে চা খাইয়ে হেসে দুটো মিষ্টি কথা বলে সরাসরি সে-প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে উমা সকলকে বিদায় করে দিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সে টিউশনিতে যেতে ভুলে গিয়েছিল। এবার আর দুর্বোধ্য

নয়, স্পষ্টই বুঝতে পারল যে স্বামীর মুক্তি-সংবাদে সে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ফের সেই পুরণো দিনের পুনরাবৃত্তি! অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারেনি, ভেবে ভেবে সারা হয়েও হদিশ পায়নি ভাবনার। এবার কি সত্যি-সত্যিই তাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে নাকি? রাত-ভোর ভয়ানক বীভৎস সব স্বপ্ন দেখেছে, আর সকালে উঠেই ভুলে গেছে সব কিছুই? আশ্চর্য!

'বল না মা, বাপি আসবে নাকি আজ?'

'কি জানি, আসবে হয়ত! তুমি এখন তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে পড়তে বস।'

বিছানায় শুয়ে শুয়েই মিনু প্রশ্ন করছিল। অন্যদিন এই অবস্থাতেই তাকে টেনে তুলে মুখ ধোয়াতে পাঠাতে হয়। আজ সে নিজেই তড়াক করে উঠে বসল। বলল, 'এক্ষুণি আমি মুখ ধুয়ে আসছি। কিন্তু আজ আর পড়ব না মা, রোজই তো পড়ি।'

'রোজই তো খাও! তবু—'

উমার গলা জড়িয়ে ধরে মিনু বলল, 'না মা, লক্ষ্মি-মা—বাপি আসবে আজ! তুমি আমায় সাজিগুজি করে দাও, আমি চুপটি করে জানালার ওপর বসে থাকব, একটুও দুষ্টুমি করব না। দূর থেকে বাপিকে দেখলেই—'

'এখন যাও, চোখে মুখে জল দিয়ে এস আগে।' গম্ভীরভাবে কথাগুলি বলে উমা তাড়াতাড়ি বিছানা গুছোতে লাগল। খেয়াল ছিল না, কাজে তাই ঢিল দিয়েছিল—নইলে কত

কাজ বাকি এখনও। সকালেই যখন আসছে মানুষটা, এত দিন পরে জেল থেকে ফিরে আসছে—কুকারের সিদ্ধ-ভাত তো আর সামনে বেড়ে দেয়া যায় না? রান্নার একটা ব্যবস্থা করতে হয়, বাজারে পাঠাতে হয় কাউকে, ইসকুলেও একটা খবর দেয়া দরকাব। এবার অবিশ্যি স্পষ্টই সে জানিয়ে দেবে যে ওই ভাবে যদি চলে ভূপেন তবে তার সঙ্গে উমার থাকা আর সম্ভব হবে না। দাম্পত্য জীবনে গোঁজামিল অসম্ভব। কিন্তু দেড় বছর পরে একটা মানুষ জেল থেকে ফেরা মাত্রই তো হাজার সত্যি হলেও এই ধরণের কথাগুলি বলা যায় না মুখের ওপর! বিশেষ মানুষটা যখন শত্রু নয়, স্বামী।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই মিনু ফিরে এল। 'আমার মুখ ধোয়া হয়ে গেছে মা, এই দেখ দাঁত—কেমন ধপধপ করছে! এবারে—'

'মাসিকে একবার ডাক তো।'

'সাজিগুজি—?'

'যা বলি শোন আগে।' উমা ধমক দিয়ে উঠল।

ম্লান মুখে মিনু বেরিয়ে যাচ্ছিল, নিভাননী ঘরে ঢুকলেন।

'এসো নিভাদি, তোমাকেই ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম।'

উমার কথায় কান না দিয়ে নিভাননী বললেন, 'এই সাত-সকালে মেয়েটাকে বকছিস কেন বলত? এতদিন পরে বাপ আসছে, খুশিতে বলে মেয়েটা সারা বাড়ি মাথায় করেছে।'

'ও, এই ক'মিনিটেই বুঝি পাড়া জানান্ হয়ে গেছে?'

'কেন, পাড়ার কেউ জানত না কি। ছেলেরা কোন্ ভোরে দল-বেঁধে বেরিয়ে গেছে।' দু'পা এগিয়ে এসে সস্নেহ অনুযোগের স্বরে নিভাননী বললেন, 'তুই এখনও ভূত সেজে আছিস! তাড়াতাড়ি সব সেরে নে, তারপর স্নানটান করে একটু সব্যিভব্যি হয়ে থাক। এমনিতেই যা চেহারার ছিরি করেছিস, চিনতে পাবলে হয়!'

'স্নান করে চন্দনের ফোঁটা কেটে বেনারসী জরোয়া পরে পথের পানে হাঁ করে চেয়ে থাকি, কেমন?'

'যদি থাকিসই, লজ্জা কিসের লো? পরপুরুষের তরে তো আর থাকছিসনে—ন্যাকামি ছাড়।'

'ন্যাকামি আমি কবি না নিভাদি। কিন্তু কাকে এখন বাজারে পাঠাই বল তো? পরিতোষ বাবু নিশ্চয় চলে গেছেন—'

'নিজেই যা না, অমন মন্দ-মেয়ে তুই! আর না গেলেই বা বাজারে, উনি কি তোর কথা শুনতেন নাকি? হাবুলদের সঙ্গে যাসনি বলে যা চটে গেছেন!'

উমা হাসল। চাকরীজীবী নির্বিবোধ প্রৌঢ় ভদ্রলোক। আর পাঁচজন বয়স্ক কেরাণীর মতই সংসারের নানান ঝামেলায় সদাব্যস্ত। নিভাদি চাকরী করেন না, কিন্তু এই নাতিবৃহৎ সংসারটির হাল তিনিই ধরে আছেন। স্বামী-অন্ত প্রাণ, পাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ের মা হলে কি হবে, স্বামীর প্রসঙ্গে এখনও মুখের আদল তাঁর বদলে যায়। নিজের সত্তা একেবারে বিসর্জন দিয়ে কি ভাবে স্বামীকে আশ্রয় করে বাঁচতে হয়, দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে হয়, তার আর্ট ভালো করে জানেন নিভাদি।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ওদের খিটিমিটি না লাগে তা নয়, কিন্তু সেটা কখনও জীবনের জটিলতম সমস্যা হয়ে দেখা দেয় না। খাওয়া-পরার দৈনন্দিন গতানুগতিক জীবনে ওঁরা খুশি, তৃপ্ত। অতি-সাধারণ নাতিশিক্ষিতা কোন নারীর যৌবন পেরিয়ে এসে জীবনের জটিল সমস্যা উপলব্ধির ক্ষমতা থাকে না, কুড়ি বছরের কেরাণীও জীবনকে নিতান্ত শাদামাঠা হিসেবে গ্রহণ করতেই অভ্যস্ত। উমা-ভূপেনের মনোমালিন্যকেও ওঁরা তাই সাধারণ দাম্পত্য কলহ বলেই ধরেছেন। সকালে ঝগড়া করে না খেয়ে অপিসে গিয়ে সন্ধ্যায় যখন শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে পরিতোষ বাবু ফিরে আসেন, স্বাভাবিক ভাবেই সারাদিনের অনাহারী নিভাদি এক হাতে পাখা আবেক হাতে সরবতের গেলাস নিয়ে হাসি মুখে অপরাধী ভঙ্গিতে সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন। আর চাপা স্বরে সামান্য কয়েকটা কথা কাটাকাটির পর ভরদুপুরে না-খেয়ে না-দেয়ে যে মানুষটা বেরিয়ে গেল, একেবারে দেড় বছরের মত জেলে চলে গেল—সে আজ ছাড়া পাবে অথচ স্ত্রী জেলগেটে তাকে স্বাগত জানাবে না, জেলগেটে না যাক নিজের ঘরেও অন্তত তাকে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকবে না—একথা ভাবতেই পারেন না পরিতোষ বাবু নিভাদি। নিভাদির ওপর মায়া হয়, হয়ত খানিকটা ঈর্ষাও জাগে।

মুখে হাসি টেনে এনে উমা বলল, 'তোমার মত স্বামীভাগ্য যদি সকলের হত নিভাদি!'

'এ সব কি অলুক্ষণে কথা, ছি!' নিভাননী এসে উমার হাত

ধরলেন, 'মেয়েমানুষের এত দেমাক ভালো নয় লো।'

'দেমাক!'

'তবে কি, অভিমান? বেশ তো, অভিমানের মান যে রাখবে সে আগে আসুক, দেখবি পায়ে ধরে মান ভাঙাবে।'

নির্বিকার কণ্ঠে উমা বলল, 'মান-অভিমানের কথা নয় নিভাদি, এ হল—'

'থাম মুখপুড়ি, তোর কোন কথা আমি শুনতে চাইনে। মুখ্যুসুখ্যু হলে কি হবে, মুখ দেখে আমরাও কিছু কিছু বুঝি, বুঝলি। এই দেড় বছর ধরে হাসি নেই তোর মুখে, দিনকে দিন চেহারা—'

ম্লান হেসে উমা বলল, 'তা দুঃখ এক-আধটু হবে না কেন বল, মানুষটা তো আর পর নয়! তার ওপর সংসারের সব দায়িত্ব। দুদণ্ড বসে হাসব যে টিউশনি চাকরী করে সময় পাই নাকি?'

নিষ্প্রাণ নিরুত্তেজ স্বর উমার। নিভাননী অবাক চোখে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকেন—তাঁর প্যাঁচানো কথারই সহজ সরল জবাব দিল উমা, অথচ এর পর কি বলে জের টানা যায় কথার?

লেখাপড়া জানা চাকুরে মেয়েদের ধরণই এমনি—নিজের মনকে নিভাননী এই বলে প্রবোধ দিয়ে খানিক চুপ করে থেকে আচমকা এক নতুন প্রসঙ্গে এনে ফেললেন, 'এবেলা আর রান্নার হাঙ্গামা করিসনি, আমার ওখানেই দুটি খাবি সবাই। এখন একটু মাথা ঠাণ্ডা করে থাক দিকি।'

মিনু এতক্ষণ আয়না-চিরুণী-রিবন হাতে নিয়ে এক পাশে চুপচাপ

দাঁড়িয়ে ছিল। উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আজ আমাদের নেমন্তন্ন বড় মাসি? সব্বাইকার?'

'হ্যাঁ মাসি, সব্বা-ইকার। তুমি বরং বুলুদির কাছ থেকে চুল বেঁধে এসো, মাকে একটু কাজ করতে দাও।'

ঈস্, দেড় বছর আগেকার কয়েকটা দিনকে যদি মন থেকে আজ একেবারে মুছে ফেলা যেত!

আসলে সত্যিই তো মানুষটা ভূপেন খারাপ নয়। উমাকে যে ভালোবাসে তাতেও সন্দেহ নেই। মানুষটা শুধু বদলে গেছে, ভয়ানক রকম বদলে গেছে—তাই ভালোবাসার ধরণও তার বদলে গেছে। উমা যা চায় যে ভাবে চায়, পাচ্ছে না—এই মাত্র। কিন্তু এইটেই বা কম কি? কোন রাজনৈতিক নেতাকেই যদি বিয়ে করার সাধ হত, নিশীথ তো অনেক যোগ্য পাত্র ছিল ভূপেনের চেয়ে। নিশীথকে বিয়ে করলে চিরদিনের জন্যে বাপ-মায়ের সঙ্গে এমন একটা মন-কষাকষির সৃষ্টি হত না, বউবাজারের এই এঁদো গলির ভাড়াটে বাড়ির দেড়খানা ঘর নিয়ে নয়—আবাল্য যে-পরিবেশে মানুষ হয়েছে বিবাহোত্তর জীবনটাও কাটাতে পারত সেই রকম পরিবেশ, হেসে খেলে আর পাঁচটা বান্ধবীর মত। কিন্তু না, সে সব কিছু চায়নি উমা, অহেতুক প্রাচুর্যের পরিবেশ নয়, রাজনীতির হট্টগোলও না—শান্ত সুখী নিরিবিলি ছোট্ট একটি সংসারের স্বপ্নই সে দেখেছে ভূপেনের সঙ্গে আলাপটা ঘনিষ্ঠতার হবার পর থেকে। ভূপেনের গলায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনতে শুনতে

তার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকেছে আর সেই স্বপ্নটা জোরালো এক বাসনার জোয়ার হয়ে যা-মন-চায়-তাই করার বেপরোয়া নেশায় আকুল করে তুলেছে তাকে। শুধু স্বামী আর সন্তান নিয়ে একটি পৃথিবী—পৃথিবীর কারো কোন ক্ষতি তারা করতে চায় না—তেমনি নিজেদের জীবনে বাইরের কোন অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপও সহ্য করবে না। যদি কোন দুঃখ আসে বেদনা আসে, ভয় কি—কালো রোগা অতি-সাধারণ একটি মানুষের—তার স্বামীর—গলায় আছে সোনারকাঠির যাদু। আশ্চর্য এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি করে ভুলিয়ে দেবে সব কিছু।

এ স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাঁচবে কি নিয়ে? বিশেষত উমার মত মেয়ে—কত কিছু করবার সাধ ছিল যার জীবনে, কিন্তু শুধু এক সকলের অমতে জোর করে ভূপেনকে বিয়ে করা ছাড়া আর কিছুই যে করতে পারল না!

তার এই স্বপ্নকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছিল নিষ্ঠুর ভূপেন। গানকে সে করেছিল শ্লোগানের শামিল। উমাকে তার গান শোনাবার অবসর হত না, কিন্তু দ্যাখ গিয়ে, মাঠে-ময়দানে সভার আগেই সে হারমোনিয়াম নিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কী-সব গান! সে গান শুনে চোখের সামনে ক্ষণে ক্ষণে পৃথিবীর রূপ বদলায় না, থরথর করে ওঠে না দেহ-মন দুর্বার আবেগের উত্তেজনায়—সে-গানে জীবন-যৌবনের সব স্বপ্ন-কামনা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, রূঢ় বাস্তব বীভৎস পৃথিবীটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

'কি করবো বলো, গানকে আমিই কি কম ভালোবাসতাম ! ভালো অবিশ্যি গানকে আজো বাসি।'

'এই তার নমুনা !'

'কি করব, গায়ককে যদি উদয়াস্ত কেরাণীগিরি করতে হয়—'

'বেশ, তুমি চাকরী ছেড়ে দাও, টিউশনি ছেড়ে আমি ইস্কুলে কাজ নিই। তবু তুমি ওপথ ছাড়।'

'একজনের জন্যে আরেকজনের জীবন বলি দেয়ার চেয়ে যাতে দুজনের জীবনই সার্থক হয়ে ওঠে সেটাই কি বড় কথা নয় উমা ? যে সমাজে গায়ক শুধু তার নিজের মর্যাদাতেই বাঁচতে পারে—'

এর পরেই সমাজ-বিপ্লবের কথা এনে ফেলত। অবিকল মেঠো বক্তৃতা—রাম শ্যাম যদু মধু সবাই যা আজকাল বলে, যা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে উমার। কিন্তু মাঠে-ময়দানে যে কথা বলবার, নেতা হয়ে নাম কেনবার জন্যে খবরের কাগজে যে কথা বলা দরকার—সে সব কথা বলে লাভ কি উমার কাছে ? তবে কি ভূপেন আজ আর শুধু উমার মন পেয়ে খুশি নয়, সে চায় আরও অনেকের, সম্ভব হলে সারা দেশের মন ? উমার দাম ফুরিয়ে গেছে তার কাছে যে-উমা তার জন্যে ছেড়ে এসেছে সব কিছু ? না, তা নয়, উমা জানে, আসলে রাজনীতিটা হল বড়লোকের বিলাস, নয়ত নিতান্ত অকর্মণ্যদের নিজেদের অক্ষমতার অজুহাত। যাদের কিছুই করার সাধ্য নেই, তারাই শুধু ভেক নেয় রাজনীতির। না হয় হলই রাজনীতি করা অতি মহৎ কাজ, কিন্তু এ ভাবে আত্মবঞ্চনায়

লাভ কি? উমাকে পেয়েও কি তৃপ্ত নয় ভূপেন যে আরেকটা কিছু করার বেপরোয়া নেশায় সঁপে দিচ্ছে নিজেকে? জীবন ব্যর্থ করার মধ্যেই খুঁজছে জীবনের চরম সার্থকতা?

'শুধু বর্তমানকে নয়, ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হয় উমা। মানুষ শুধু নিজে বাঁচেনা, তার সন্তানের মধ্যে দিয়েও বাঁচে।'

ক্ষেপে গিয়েছিল উমা।—'ও সব বড় বড় কথা ছাড়। শুধু নিজেদের নিয়ে আমরা খুশি থাকতে চাই, কেন তুমি এতে বাদ সাধবে?

হেসে ভূপেন বলেছিল, 'কিন্তু তোমার-আমার খুশির ওপরেই তো পৃথিবী চলে না, উমারাণী! তুমি-আমি না চাইলেও অনেক কিছুই আমাদের চেয়ে বসে যে! এই সমাজে বাঁচতে হলে সমাজ তার পুরো দাবি আদায় করে নেবে। নেবে কি, নিচ্ছে —দেখছ না? অবিশ্যি পশুর জীবন গ্রহণ করলে খানিকটা রেহাই—'

'অর্থাৎ আমার জীবন!' ফোঁস করে উঠেছিল উমা। যা নয় তাই বলে ঝগড়া করেছিল। তারপর না খেয়ে ভূপেন বেরিয়ে গেলে কেঁদেছিল সারা দুপুর নিজের জীবনের মহাভুলের আর অশেষ দুঃখের কথা ভেবে ভেবে। এই মানুষটার জন্যে সব কিছু ছেড়ে এসেছে সে!

বারান্দা দিয়ে ছুটতে ছুটতে এলেও মিনু ঘরে ঢুকল কিন্তু অতি সন্তর্পণে। হোক ছ'বছরের মেয়ে, মায়ের মেজাজটা সে ঠিকই টের পেয়ে যায়।

'তুমি এখনো নাইতে গেলে না মা? বড় মাসি বললে—
'তুমি পড়তে বসলে!'
'বা-রে, বড় মাসী যে বললে আজ আমারও ছুটি তোমারও ছুটি।'
'বড় মাসি বুঝি আজ আমার হয়ে ইসকুলে যাবে?' হঠাৎ মেয়ের দিকে চোখ পড়তেই উমা থমকে গেল। দু'বিনুনি করে চুল বাঁধা, চুলে লাল রিবন, মুখে পাউডারের প্রলেপ, চোখে ঘন কাজল। পরণে আধ-ময়লা ছেঁড়া জাঙিয়া। সবাই বলে মেয়েটা নাকি দেখতে হয়েছে মায়র মত, কিছু চোখে ছুটি পেয়েছে বাপের। মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়েই থমকে গিয়েছিল উমা।
'আমার সেই লাল জামাটা বের করে দাও না মা।'
উমা জবাব দিল না।

বাপের এত ন্যাওটা ছিল, অথচ মেয়ের জন্যে কত দরদ বাপের! মানুষ হলে ও কখনও রাজনীতির নামে সংসারের দায় এড়িয়ে এভাবে জেলে পালাত? পালাতে পারত? ও জেলে গেলে আজকালকার দিনে একা উমা কি করে সংসার চালায়, ভাবল একবারও সে কথা? ছাঁটাই বন্ধ করার জন্যে নাকি আন্দোলন শুরু করেছিল ভূপেনরা, কিন্তু বেকার হয়েও যদি সব সময় গান নিয়েই ভূপেন থাকত—দুটো চাকরী করে বা যে করে হোক সংসার চালাত উমা, খুশি মনেই চালাত। তাতে সান্ত্বনা ছিল, শান্তি ছিল—মাথা উঁচু করে তাহলে চলতে পারত। কতকগুলি বদমাইসের পাল্লায় পড়ে বকে যাওয়া বলে মনে হত না।

স্বামীকে।

'বদমাইস্!'

'তাছাড়া কি?' উমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, 'জামাইবাবু আজ এসেছিলেন, সব কীর্তি-কাহিনী তোমাদের ফাঁস করে দিয়ে গেছেন—ছি ছি!'

'কি বললেন তোমার জামাইবাবু?'

'সব স-ব। বাইরে ভালোমানুষ সাজলেও ভেতরে ভেতরে তোমরা খুনে, কি ভাবে তোমরা দেশের সর্বনাশ করবার জন্যে মতলব করেছ—সব ফাঁস করে দিয়ে গেছেন।'

'তাই নাকি!' সশব্দে হেসে উঠে একটু থেমে নিস্পৃহ স্বরে ভূপেন বলেছিল, 'তবে কি জানো, রকে আড্ডামারা কোন বখাটে ছেলে একথা বললেও গুরুত্ব দিতাম, কিন্তু তোমার জামাইবাবু হলেন গিয়ে—পুলিশ অফিসার!'

'কি, কি বললে!'

'পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কথাটা যে বুঝতে পেরেছ তা তোমার উত্তেজনাতেই স্পষ্ট।'

সত্যি সত্যি উত্তেজিত হয়েছিল উমা, ভীষণ উত্তেজিত। হঠাৎ যেন মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে গিয়েছিল। জামাইবাবু এসে যখন তার স্বামীর বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ করছিলেন, তখন অভিযোগের সত্যি-মিথ্যের কথা না ভেবেই সে রেগে গিয়েছিল তাঁর ওপর। হন না আপনার জন, তবু তার স্বামী সম্বন্ধে অপরে কেন যা-তা বলবে? কী স্পর্ধা! নিজে সে স্বামীকে যাই বলুক, কিন্তু অন্যের মুখে কেন শুনবে স্বামীর

নিন্দে? আত্মসম্মানে বড় বেজেছিল উমার। সকলের অমতে স্বেচ্ছায় যাকে স্বামী বলে বরণ করেছে, তার সমালোচনা শোনা যে কী মর্মান্তিক—নিজেরই চরম পরাজয়ের সংবাদ শোনা যেন! কোনমতে ভদ্রতা বজায় রেখে জামাইবাবুকে বিদায় দিয়েছিল।

কিন্তু এখন আবার ভূপেন জামাইবাবুকে অপমান করায় কেন জানি উল্টো রাগ হয়ে গেল ভূপেনরই উপর। অসহ্য রাগ। জামাইবাবুকে তো জানে, পনের বছর পুলিশে চাকরী করলে কি হবে, অমন সাত্ত্বিক মানুষ আর হয় না। পুলিশ অফিসার, কিন্তু কোন বদ নেশা দূরে যাক, পান পর্যন্ত খান না। নিয়মিত সন্ধ্যা-আহ্নিক করে জলস্পর্শ করেন। ঘুষ নেননা বলে আজো তিনি কমিশনার হতে পারলেন না। সত্যি যদি-না ভেতরে কোন খারাপ কাজ করবে ভূপেনরা, কেন তবে তিনি বাড়ি বয়ে এসে তাকে সাবধান করে দিয়ে যাবেন? তাঁকেই কিনা ভূপেন বখাটে ছেলেদের সঙ্গে তুলনা করল? তুলনা করল কি, আরও ছোট করল তাদের চেয়ে? অমানুষ ভূপেন! সকলের অমতে ভূপেনকে বিয়ে করে কি ভুলই যে করেছে সে! বুড়ো বাপ-মায়ের মনে ব্যথা দেয়ার এই সাজা, না জানি তার কত জন্মের পাপের শাস্তি! গলায় দড়ি দিয়ে মরা ছাড়া আর গতি নেই উমার! গলায় দড়ি সে দিত, অনেক আগেই দিত, শুধু মেয়েটা আছে বলে!

ভূপেন একটি কথারও জবাব দেয়নি। কোন প্রতিবাদ করেনি।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে পরে অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখে অতিশয় শান্তস্বরে বলেছিল, 'মনের মধ্যে যে কথাগুলো জমা হয় উমা, উত্তেজনার মুহূর্তে তাই বেরিয়ে আসে। আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা যে কি স্পষ্ট বুঝলাম। একদিন তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে, সত্যি সত্যি ভালোবেসেছিলে। কিন্তু ভালোবাসারও জন্ম-মৃত্যু আছে! এরপরে আর আমাদের এইভাবে সংসার সাজিয়ে দিন কাটানোর কোন মানে হয় না।'

'সত্যি হয় না। আমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে!'

'বেশ, আজই আমি চলে যাচ্ছি, এক্ষুণি!'

'তুমি যাবে কেন, আমিই এ বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি। এখানে মুখ দেখাবার আর জো আছে আমার!'

'সে তোমার সুবিধেমত যা হয় কর। আপাতত তোমার চেয়ে আমার যাওয়াই সুবিধে—তুমি মেয়েমানুষ।' দুপুর রোদে বাড়ি ফিরে জামা কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম করছিল ভূপেন, কথা বলতে বলতে ফের জামা গায়ে দিল।

'আমার অবর্তমানে তোমার কোন আর্থিক অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, বেকার পোষার খরচটা অন্তত কমল! তাছাড়া, আমাকে ছেড়েছ শুনলে তোমার বাবা খুশি হয়ে হাজার কয়েক টাকাই হয়ত দিয়ে দেবেন—বড়লোক ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে টাকাটা তো আলাদা করেই রেখেছিলেন শুনেছি।' কথাটা শেষ করেই ভূপেন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। পাশেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল

মিনু, কথা বলে দূরে থাক, তার দিকে ফিরে তাকায়নি পর্যন্ত। বাপের সঙ্গে খাবে বলে অত বেলা পর্যন্ত হাঁ করে বসে ছিল মেয়েটা !

সেইদিন সন্ধ্যায় তার এ্যারেস্টের খবর নিয়ে এসেছিল হাবুল।

মিনু ঠায় দাঁড়িয়ে।

হাতের কাজকর্ম সেরে নিয়ে বাক্স খুলে উমা একটা ফ্রক বের করে দিল।

ভয়ে ভয়ে মিনু আব্দার জানাল, 'ওই লাল জামাটা দাও না মা, বাপি যেটা কিনে দিয়েছিল।'

'ওটা যে ছোট হয়ে গেছেরে !'

মা'র স্বাভাবিক স্বর শুনেই মিনু পিছন থেকে একেবারে তার গলা জড়িয়ে ধরল, 'হোকগে ছোট, বাইরে তো যাব না— দাও মা লক্ষ্মিটি !'

দ্বিরুক্তি না করে উমা জামাটা বের করে দিল। জামা নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল মিনু। মা'র মুখ দেখে আনন্দটা একটু থিতিয়ে এসেছিল, মার স্বাভাবিক দুটো কথা শুনেই সেটা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে।

সত্যিকথা বলতে কি, ভূপেনের গ্রেপ্তারের খবর শুনে তেমন বিচলিত হয়নি উমা, বরং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। ভাগ্যিস সময়মত পুলিশ ভূপেনকে ধরেছে, নইলে তাদের

মধ্যে সত্যি সত্যি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে কি করে মুখ দেখাত? এই বিয়ের এই পরিণাম তো জানা কথা—সকলে যখন মুখচোখের ভাব এই রকম করে তার দিকে তাকিয়ে থাকত, কি করে তা সহ্য করত? এ একরকম ভালোই হয়েছে, আপাতত দেড় বছরের মত নিশ্চিন্ত। মনে শোক না জাগলেও স্বামীর জন্যে এখন লোক-দেখানো শোক করা চলবে। আসলে, মনে কোন শোক নেইও উমার। বরং ভূপেনকে পুলিশে না ধরলেই এই ভেবে তার অনুতাপ হত যে জামাইবাবুর কথা শুনে কতকগুলি মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে সে স্বামীকে, আফশোষে হাসফাস করত মন। এখন তো স্পষ্টই বোঝা গেল, সত্যি ভেতরে ভেতরে ভীষণ রকমের কোন বদ মতলব ছিল ওদের। নইলে কেন ধরবে পুলিশে—যে-পুলিশের বড় কর্তা তার জামাইবাবু?

জেল থেকে চিঠি লিখেছিল ভূপেন, তার সব অপরাধ যেন উমা ক্ষমা করে। অপরাধ সে পৃথিবীতে করেছে মাত্র দুজনের কাছে—উমা আর মিনু—অন্যায় সে কিছুই করেনি। তার নামে যে যে-অভিযোগই আসুক—সব মিথ্যে। অন্যায় নয়, অন্যায়ের প্রতিবাদই সে করতে চেয়েছিল, বেঁচে থাকলে আবার চাইবে। দীর্ঘ দুপাতা চিঠি, কিন্তু সেন্সারে কাটাকুটি করে সে চিঠির আর কিচ্ছু রাখেনি। ভূপেন অন্যায় করেনি বললেই যে উমা তা বিশ্বাস করবে তা নয়, স্বামীর বক্তব্য শোনার জন্যে তেমন কোন উৎকণ্ঠাও তার ছিল না, কিন্তু চিঠিটার আষ্টেপৃষ্ঠে মোটা মোটা কালির দাগ দেয়ায় চিঠিটা

আগাগোড়া পড়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছিল উমা। একি বিচ্ছিরি কাণ্ড! ভূপেন অন্যায় করেছে, তার সাজাও সে পাচ্ছে, তাই বলে তিন বছরের মেয়ের কাছে লেখা চিঠিটাও এভাবে কাটাকুটি করে মানুষে! পাগল নয়ত ভূপেন যে অ-আ পড়া একরত্তি একটা মেয়ের কাছে এমন সব কথা লিখবে যা পড়ে বিপ্লবী হয়ে উঠে রাষ্ট্রের উচ্ছেদের জন্যে উঠেপড়ে লাগবে সে! এ বাড়াবাড়ি, নিছক বাড়াবাড়ি—বাপের চিঠি পড়তে না পারায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মেয়ের কান্না দেখে আপন মনেই বিড়বিড় করে বলেছিল উমা।

প্রথমে মাস কয়েক নিয়মিত চিঠি দিয়ে গেছে ভূপেন, কিন্তু একটিবও জবাব উমা দেয়নি। সুযোগ পেয়েও জেলে গিয়ে দেখা করেনি তার সঙ্গে। অথচ মাঝে মাঝে সত্যি তার ইচ্ছে হত মানুষটার মুখটি একবার দেখতে—চিঠি পড়লেই মনটা যেন কেমন করে উঠত।

'বাপিকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে, না মা?'

'হ্যাঁ।'

'বাপিকে কেন ধরল মা?'

'জানিনা।'

'বাপিকে আর ছেড়ে দেবে না মা?'

এ বড় মাবাত্মক প্রশ্ন। দেড় বছবের জেল হয়েছে ভূপেনের, হোক। দেড় বছরেব মধ্যে মানুষ অনেক বদলায়। ভূপেনও যে বদলাবে না কে বলতে পারে? আজকাল চিঠি পড়লেই তো মানুষটাকে অন্য মানুষ বলে মনে হয়—যেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতেব

সেই অকৃত্রিম শিল্পী স্বপ্নদর্শী দুই চোখ মেলে চেয়ে আছে— চিঠির দিকে তাকালেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। হয়ত ভূপেন অতখানি অন্যায় করেনি, অন্যায় করলে মানুষের কখনও এত মনের জোর থাকে? হয়ত কোন অন্যায়ই করেনি, ভুল করেছে। ভুল কি মানুষ করেনা? মানুষই তো ভুল করে—মানুষই ভুল ভাঙায়। উমা শুধু আঘাতই দিয়েছে, শুধু আঘাত দিয়েই ভুল ভাঙানো যায় নাকি মানুষের, অতিআপনার জন যে মানুষ! নিজের ভুল যদি স্বীকার করতে চায় ভূপেন, সব ভুল তার ভাঙিয়ে দেবে উমা। নতুন করে ফের জীবন শুরু করবে। কিন্তু সারা জীবন ভূপেনকে ছেড়ে—উমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

'পুলিশ কাদের বলে মা?'

'কাদের আবার, পুলিশ পুলিশকে বলে।'

'পুলিশ বুঝি মানুষ ধরে?'

'দুষ্টুমি করলে ধরে।'

'বাপি কি দুষ্টুমি করেছিল মা?'

জবাব দেয়না উমা। সঙ্গে সঙ্গে জবাবটা ঠিক খুঁজে পায়না।

'পুলিশকে কেমন দেখতে মা? আমার মত বাচ্চু আছে পুলিশের?' একের পর এক প্রশ্ন করে যায় মিনু, 'আচ্ছা মা, পুলিশের হাত-পা আছে? ওরা কোথায় থাকে মা, বনে?'

কোন কথার জবাব দেয় না উমা। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, 'বাপিকে তোর বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে, নারে?'

কথা কইতে গিয়ে ঠোঁট দুটি থরথর করে কেঁপে উঠেছিল মিনুর। হঠাৎ উমার বুকে মুখ গুঁজে ঝর ঝর করে

কেঁদে ফেলেছিল।

'যাবি তোর বাপিকে দেখতে? চিঠি লিখে দে, সামনের রোববার তোকে নিয়ে যাব।'

পরের দিন বিকেলে চিঠি এসেছিল ভূপেনের—প্রেসিডেন্সী নয়—বক্সা ক্যাম্প থেকে!

'হ্যাঁরে লক্ষ্মিছাড়ি, আর ঘর গুছোতে হবেনা। এবার যা, স্নানটান সেরে আয়। ওকি, বাক্স খুলে বসে আছিস কেন?' রান্না করতে করতে উঠে এসেছেন নিভাননী, 'কি, শাড়ি বুঝি আর পছন্দ হয় না!'

'বয়ে গেছে আমার।' তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করে উমা উঠে দাঁড়াল।

'থাক থাক আমার কাছে আর লজ্জা করে না—যা বের করছিলি কর, তাড়াতাড়ি নে।'

'পাগল নাকি, কি দরকার মিছিমিছি একটা কাপড়ের ধোপ ভাঙবার।'

'যত্ত সব ঢং!' নিভাননী এগিয়ে এলেন, 'নোংরা হাত আর লাগাব না—খোল ডালা, দেখি।' জোর করে বাক্সের ডালা খোলালেন, 'ওই যে দেখা যাচ্ছে, ওই, ওই নীলাম্বরীটা—'

'ক্ষেপেছ!'

'যা বলি শোন ছুঁড়ি।'

'মরে গেলেও না।' তাড়াতাড়ি একটা শাদা শাড়ি বের করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল উমা, 'বেশী যদি ইয়ে কর নিভাদি তাহলে

এও পরব না।' গামছা সাবান নিয়ে তরতর করে বেরিয়ে গেল।

একবার ঘরে জানালায় এসে বসছে, একবার সদরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে,—ছটফট করছে মিনু।

বসে বসে শেলাই করলে কি হবে, ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে উমাও। তাড়াতাড়িতে খেয়াল হয়নি, কলঘরে গিয়ে দেখে কি, ভূপেনের উপহার দেওয়া সেই শ্রীনিকেতনের শাড়িটাই বের করে ফেলেছে। শাদা শাড়ি কিন্তু পাড়টি বড় প্রিয় ভূপেনের। নিজের পাঞ্জাবীর কাপড় কিনতে গিয়ে নিজের জন্যে কিছু না কিনে নিয়ে এসেছিল এই শাড়িটা। দেখে-শুনে ভীষণ রাগ করেছিল উমা, তাকে বুকে টেনে নিয়ে ভূপেন বলেছিল, 'যাই বলো, এ শাড়ি পরে রাগ করলেও সুন্দর দ্যাখায়। কী সুন্দর আর 'সোবার' পাড়!' ধোপ-ভাঙা সেই শাড়ি আজ তার পরনে! দেখলে ভাববে কি মানুষটা—এই দেড় বছর ধরে বুঝি হা-পিত্যেশ করে বসেছিল উমা। আর শুধু কি শাড়ি, বুলু এসে জোর করে সুর্মা পরিয়ে দিয়ে গেল, বিভাদি কপালে সিন্দুরের ফোঁটা দিলেন, শানু না কে যেন অগুরুও খানিকটা গা'ময় ছিটিয়ে দিয়েছে। ছি ছি, এ বেশে কি করে দাঁড়াবে সে ভূপেনের সামনে!

সমস্যাটায় বড় বেশী ভাবিত হয়ে পড়েছিল উমা, সমাধান হয়ে গেল আকস্মিক ও অভাবিত ভাবে। ফিরে এল পাড়ার ছেলেরা। ম্লান মুখে হাবুল এসে দাঁড়াল।

'আবার এ্যারেস্ট করল, স্পেশাল পাওয়ার্সে।'

আস্তে আস্তে শেলাই সরিয়ে রাখল উমা। হাবুলের মুখের দিকে তাকাল। ঘরের মধ্যে সকলে ভিড় করে এসেছে।

'জেলগেটেই এ্যারেস্ট করল। এবার আর কোন বিচার হবে না, কবে ছাড়ে তারও ঠিক নেই। ওয়ারেণ্ট নিয়ে তোমার জামাইবাবু এসেছিলেন, বৌদি।'

ফ্যালফ্যাল করে উমা তাকিয়ে আছে তো আছেই।

'যাওয়ার সময় ভূপেনদা তোমাদের সকলের কথা বললেন, ভাবতে মানা করলেন। আমাদের বললেন, এভাবে ফুলের মালা নিয়ে নয়, পারি তো অন্য ভাবে তাঁকে যেন ছাড়িয়ে আনি!'

কাঁদ কাঁদ মুখে মিনু বলল, 'বাপি এলনা হাবুলকা?'

'না সোনা, তোমার বাপিকে ওরা আবার ধরে নিয়ে গেল।'

'ওরা কারা হাবুলকা, ওরা কারা?' হঠাৎ হাবুলের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল মিনু, চোখের জলে আর কাজলে তার ছোট্ট মুখখানিতে এক কোমল-হিংস্র আভা ফুটে উঠল, 'কারা আমার বাপিকে ধরে নিয়ে গেল হাবুলকা? কারা—কারা?'

উমার ইচ্ছে হল, ঠাস করে এক চড় কষিয়ে সরিয়ে আনে মেয়েটাকে। হাবুলকে ও অমন করে কেন আঁচড়াচ্ছে? হাবুলের কি দোষ?

উমার ইচ্ছে হল, একবার যদি ভূপেন ফিরে আসত, একটি বার শুধু! বলার কত কথাই যে এই মুহূর্তে হঠাৎ তার মনে জমে উঠেছে!

মেয়েকে শাসন করবার জন্যেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ মেয়ের

চোখের দিকে তাকিয়ে বুকটা উমার ধক করে উঠল। দেখতে নাকি মায়ের মত, কিন্তু চোখ দুটি পেয়েছে অবিকল বাপের। শুধু জল নয়, জলের মধ্যেও শীর্ণ একটি আগুনের শিখা ঝকঝক করছে দুই চোখের তারায় তারায়।

হয়ত এটা দেখারই ভুল, তা হোক, মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরল উমা। তারপর সকলকে বলল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। না, কান্না নয়, নানান ভাবনার টানাপোড়েনে মাথাটা তার ঝিমঝিম করছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। মেয়েকে বুকে নিয়ে, মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে একটু নিরিবিলি ভাবতে চায়।

'ফের শালা'—সত্য দারোগা এবার গর্জে ওঠেন—'এক কথা তখন থেকে জিজ্ঞেস করছি, তা তোমার—'

দারোগার উদ্যত পা-টিকেই জড়িয়ে ধরে কালীনাথ। হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে।

'মোকে বাঁচান হুজুর, মোকে বাঁচান!'

'বাঁচাব তো শালা বল্, বল্ সত্যি কথাটা—বল্ কেন গলায় দড়ি দিয়েছিলি?'

কালীনাথ জবাব দেয় না, কেবল কাঁদে। দারোগার পায়ে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

থানার বারান্দার নীচে এসে দাঁড়িয়েছে কালীনাথের ছেলে লালু। কম্পাউণ্ড পেরিয়ে ওপাশে রাস্তার কিনারে জামরুল গাছটির তলায় ভিড় জমিয়েছে একদল। কালীনাথকে ধরে আনার সময় কনেস্টবলের পিছন পিছন ওরা এসেছিল, কয়েকজন পরে এসে জুটেছে। কম্পাউণ্ডে ঢুকতে এসে তাড়া খেয়ে জামরুলের ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। লালুকেই শুধু তাড়া দিয়ে ফল হয়নি, বাপকে ছেড়ে কি করে যায় সে? বছর আষ্টেক বয়েসের ছেলেটা জানে বাপ তার কেন গলায় দড়ি দিয়েছিল কিন্তু মুখ ফুটে কারণটা কেন বলে না কালীনাথ, তার বাপ?

কারো ঘরে তো সিঁধ দিতে যায়নি, গিয়েছিল নিজেই নিজের গলায় ফাঁস দিয়ে মরতে—তবে? কেন তবে তখন থেকে দারোগা বাবুর হম্বিতম্বি সইছে এত?

বাপকে অঝোরে কাঁদতে দেখে লালুরও কান্না পায়।

'আমি বলব দার্‌গা বাবু? বলব?'

'তুই কেরে হারামজাদা?' সত্য দারোগা খিঁচিয়ে ওঠেন।

ওপাশের টেবিল থেকে রাইটার হরেন জানায়, 'কেলোর ব্যাটা স্যার—সান্‌ অব কালীনাথ ধাড়া।'

'তা ও ব্যাটা এখানে কি চায়? এ্যাই ভাগ্‌—ভাগ্‌লি! বিনয়—'

বিনয় দত্তর গার্ড ডিউটি, কনেস্টবল বিনয় দত্তর। আইন-মাফিক পুরো ইউনিফর্মে সার্ভিস রাইফেল কাঁধে ডিউটি দেয়া উচিত, কিন্তু ইউনিফর্ম গায়ে চড়াতে এখনও লজ্জা করে গ্রাজুয়েট বিনয়ের। সবে ট্রেনিং থেকে ফিরেছে কিনা। সত্য দারোগা সেটা বোঝেন, এবং বোঝেন বলেই অবৈতনিক গৃহশিক্ষকের পদে বহাল করে তার ইউনিফর্ম-পরাটা মকুব করে দিয়েছেন। শুধু তাই না, নান্তু বিল্টু পটলাকে পাশ করাতে পারলে বিনয়কে রাইটার করে দেবেন বলে কথাও দিয়েছেন—গোপন কথা।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে বিনয় থতমত খেয়ে গিয়েছিল। ডিউটি ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল কালীনাথের মুখের দিকে। নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল—মা অপোগণ্ড ভাইবোন আর বিধবা পিসির মুখগুলি ভেসে উঠেছিল, মার শেষ চিঠির

লাইনগুলি চোখের সামনে ঝাপসা ঝাপসা হয়ে মনে পড়ছিল। বড়বাবুর গলা শুনে বিনয় চমকে ওঠে, ক্ষুব্ধ হয়—আই-এ ফেল লোকটা কিভাবে পাড়া জানিয়ে হাঁকছে তাকে দারোয়ানের মত! বারান্দা থেকে লাফ দেয় বিনয়। প্রাণপণে লালুর একটা কান আঁকড়ে ধরে।

'ওরে বাবারে, গেলুমরে—মেরে ফেললে গো—'

লালুর আকাশ-চেরা আর্তনাদে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাড়াতাড়ি বিনয় হাত সরিয়ে নেয়—পুঁজে রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে তার ক'টা আঙুল।

ছেলের কান্না শুনে মুখ ফেরায় কালীনাথ। সত্য দারোগা এবং রাইটার হরেন তরফদারও ফিরে তাকায়—গ্যাখে, কিন্তু মুখে কেউ কিছুই বলে না।

শুধু জামরুলের ছায়ায় ভিড়টা একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। কয়েকটা ক্রুদ্ধ মন্তব্যের স্ফুলিঙ্গ ওঠে।

সারা শরীর ঘিন ঘিন করছে। বারান্দার বালি-ওঠা থামে হাতের আঙুলগুলি ঘষতে ঘষতে বিনয় চিৎকার করে, 'বেরো, বেরোলি বদমাস। তবেরে—'

এ-এস-আই চিত্ত মুখুজ্জে বিড়ি খাবার জন্যে আড়ালে গিয়েছিল, ফিরে এল। বিনয়ের গর্জনেও সরবার নাম নেই লালুর—ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ কচলাচ্ছে, কানের পাশ থেকে টপ টপ করে ফোঁটা ফোঁটা পুঁজ-রক্ত পড়ছে ঘাড়ের ওপর। চোখের জল দেখে মনটা যদিবা একটু নরম হয়, কানের দিকে তাকিয়ে গা ঘিন ঘিন করে ওঠে চিত্ত মুখুজ্জের।

‘ওটা থাক বিনয়, দেখো. ওগুলো যেন কম্পাউণ্ডে না ঢোকে।’
‘থাকবে কি ছোটবাবু! স্যার যে বললেন—’
‘ও, স্যার বলেছেন? তবে যারে লালু, ভাগ। যা বাবা যা, কেন মারধোর খেয়ে মরবি।’ ছেলেটা চেনা, তাই হয়ত খানিকটা মায়া জাগছিল। কিন্তু বড়বাবুর হুকুমের কথা শুনে সেই খানিকটা মায়ার সঙ্গে অনেকখানি বিরাগের খাদ মিশিয়ে চিত্ত মুখুজ্জে ধমকে উঠল, ‘গেলি ব্যাটাচ্ছেলে!’
ফোঁপাতে ফোঁপাতে থানার কম্পাউণ্ড ছেড়ে লালু বেরিয়ে যায়—জামরুল তলার ভিড়টা দু’পা এগিয়ে এসে তাকে কাছে টেনে নেয়। কালীনাথের ওপর এক জোরালো সহানুভূতিতে সকলের মন ভরে উঠেছিল, কালীনাথকে সেটা জানাতে না পেরে হাসফাস করছিল ভেতরে ভেতরে—দূর থেকে দারোগাকে খিস্তিখাবাজ করে মনের জ্বালা মেটে, কিন্তু কালীনাথকে সহানুভূতি না জানাতে পারার আফশোষটা তো তাতে আর যায় না। লালুকে নিয়ে সকলেই এখন ব্যস্ত হয়ে উঠল। পুরনো ঘা দিয়ে পুঁজ-রক্ত পড়ছে, ঘটনাটা তেমন গুরুতর কিছু না—কিন্তু কালীনাথের ব্যাটা তো লালু?
‘আহাহা, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েচে রে!’
‘শালাদের ইদিক নেই উদিক আছে—ইস, কানটা এক্কেবারে ছিঁড়ে নিয়েচে গো।’
‘বাঞ্চোৎরা!’
‘আয় বাবা আয়, ঘাটে চ—ধুইয়ে দি।’
পেন্সিল বেড়ে নিয়ে কার্বন ঠিক করতে করতে চিত্ত মুখুজ্জে

বলে, 'ডায়েরীটা তা হলে কি করব স্যার?'

'কি? কি করবে?' সত্য দারোগা তিক্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'ডায়েরী? হুঁঃ—ডায়েরী না ঘোড়ার ইয়ে করবে!'

দুই কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে বিনয়ের। মুখ নামিয়ে খিকখিক হাসে হরেন তরফদার। অপ্রস্তুত চিত্ত মুখুজ্জে। কান্না থামিয়ে কালীনাথ অবাক হয়ে তাকায় সত্য দারোগার মুখের দিকে।

'ডায়েরী করবে! হুঁ, তা আর করবে না! একেই তো প্রমোশন স্টপ হয়ে আছে, এবার চাকরীটি নট্ হবে।' সত্য দারোগা আপন মনেই গজরাতে থাকেন, 'এঃ, স্বাধীনতা না গুষ্টির পিণ্ডি! কাজ করে যদি আর সুখ থাকে! ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট কান্ট্রি—যত্ত সব—।'

'তা হলে স্যার—'

কিন্তু না, ডায়েরী একটা করতেই হবে। বড্ড জানাজানি হয়ে গেছে। চাই কি কোন্ ফাঁকে কে হুট করে খবরের কাগজে তুলে দেবে—আগে থাকতে একটা রেকর্ড রাখা ভালো। অফিসিয়াল রেকর্ড। কিন্তু, কি লিখবেন ডায়েরীতে?—রামপুর থানার চাষাপাড়ার স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ ধাড়ার পুত্র কালীনাথ ধাড়া ক্ষুধার জ্বালায় গতকল্য রাত্রে গলায় দড়ি দিয়া মরিবার চেষ্টা করে—ইত্যাদি? অক্ষর গুণে গুণে এই কথাগুলিরই ইংরেজি তর্জমা করে রাখতে বলবেন মুখুজ্জেকে? তারপর? তারপর এই কেস তো ঠেলে নিয়ে যেতে হবে কোর্ট পর্যন্ত। কোর্টে কালীনাথের বড় জোর হবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ফাটক। কিন্তু ওপর থেকে যখন কৈফিয়ৎ তলব হবে—তোমার এলাকায়

লোকে না খেতে পেয়ে গলায় দড়ি দেয় কেন, তখন? তখন সেই না-খেতে-পেয়ে-গলায়-দড়ি-দেয়ার কি কৈফিয়ৎ দেবেন তিনি? স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসী রাজত্বে অন্নাভাবে গলায় দড়ির ডায়েরী করা? হু' শালা ট্রান্সফার ম্যালেরিয়ার ডিপো কানাইপুরে—ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে মর শালা গুষ্টিশুদ্ধু! কংগ্রেসী রাজত্বে অন্নাভাবে গলায় দড়ি!

'সত্যি সত্যি বল্ কেলো, এখনো বল্—কেন মরতে গিয়েছিলি? সত্য দারোগা স্বরটাকে এবার একটু মোলায়েম করে আনেন, 'জানিস, আত্মঘাতী হওয়া বে-আইনী?'

'এজ্ঞে, জানি এজ্ঞে।'

'বল্ তাহলে।'

'বলিছি তো হুজুর—খিদের জ্বালায়। মোর খিদে মোর পরিবারের খিদে ছেলেপুলের খিদে! চোখের উপ্রে আর সইতে না পেরে হুজুর—'

'ঠিক ঠিক বল্ হারামজাদা!' সত্য দারোগা ফের ধমকে ওঠেন, আড়চোখে তাকান চিত্ত মুখুজ্জে হরেন তরফদারের দিকে। তখন থেকে বসে বসে রগড় দেখছে দুজন—হ্যাকা চৈতন! কোথায় এটাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে দেবে, তা নয়, ধিনিকেষ্টর মত কেমন ফ্যাল-ফেলিয়ে চেয়ে আছে দ্যাখ না! সবই কি মুখ ফুটে বলে দিতে হবে নাকি?

বেশ মোলায়েম স্বরেই সত্য দারোগা বলেন, 'একটু ভেবে-চিন্তে ছাখ কেলো, বেশ ভা-লো করে ভেবে ছাখ। হয়ত অন্য

কোন কারণ-টারণ ছিল—'

'মা শীত্‌লার দিব্যি হুজুর—সত্যি কথাই কইচি। চাদ্দিন না খেয়ে মাথাটা কেমন—'

'শূয়ার কি বাচ্চা, ফের—ফের ওই এককথা !' গলার স্বর আরো মোলায়েম করে আনবেন ভাবছিলেন, ভাবছিলেন মিষ্টিভাবে নিজেই আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবেন—কিন্তু আর সহ্য হল না—ক্যাঁৎ করে সত্য দারোগা প্রচণ্ড এক লাথি কষিয়ে দিলেন। লক্ষ্য ছিল দাবনা, লাগল গিয়ে পাঁজরে। থানার বারান্দা থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ল কালীনাথ। পড়ল তো পড়েই রইল মুখ গুঁজরে, মুখের আর্তনাদটা অসমাপ্ত রেখে।

'মার—মার শালাকে !'

ওদিকে জামরুল তলা থেকে বিস্ফোরণের মত এক গর্জন ফেটে পড়ল—'মার্‌ শালাকে !' বিদ্যুতের হঠাৎ ছোঁয়ায় চঞ্চল হয়ে উঠল জমাট জনতা—'মার ! মার !'

'মুখুজ্জে, মালখানা খোল, মালখানা খোল।' জামরুল তলার দিকে তাকিয়ে সত্য দারোগা দ্রুত নির্দেশ দিলেন, আমার রিভলভারটাও। বি-বি-বিনয়—'

তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে নেমে কালীনাথকে ধরে বসাল বিনয়। চোখ বুঁজে আছে, মাথাটা বুকের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। বারান্দায় কালীনাথকে ঠেস দিয়ে রেখে বিনয় উঠে আসে। এখন সে ডিউটিতে, ইউনিফর্ম না থাক তবু গার্ড ডিউটি ! মুখুজ্জে মালখানার দরজা খুলেছিল, বিনয় একটা রাইফেল তুলে নেয়। ম্যাগাজিনটা খুলে দেখে নেয় একবার।

তারপর জামরুল তলার ভিড়টির দিকে রাইফেলের ব্যারেলটি উঁচিয়ে ধরে ফের বারান্দা থেকে নেমে দাঁড়ায় কালীনাথের পাশে টেবিলের উপর রিভলভারটা মুঠো করে ধরে নিজের আসনে সত্য দারোগা চঞ্চল হয়ে ওঠেন। নাঃ, কাজটা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে। পাঁজরায় লাথি তিনি মারতে চাননি, আসলে লাথিই মারতে চাননি—সত্যিই চাননি। চোর-ছ্যাঁচড় দাগী হয়, কমিউনিস্ট হয়, বলাৎকারের আসামী হয়—চলে লাথি মারা। কিন্তু লোক ভালো কালীনাথ, ভাল লোক বলে সুনাম আছে কালীনাথের। কৃষক সমিতির বিরুদ্ধে এই কালীনাথই তো কংগ্রেসের হয়ে মিটিং করেছে, কোনদিন কোন আন্দোলনের ধারে কাছে নেই, নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে। সারা গাঁ তাকে বয়কট করছিল, তবু সে পুলিশের বিপক্ষে সাক্ষী দেয়নি। বোকা হাবা নয়, তবে সহজ সরল মানুষটা। কতবার কৃষক সমিতির কত খবর দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছে। নিজে থেকে অবিশ্যি কিছু বলেনি—সত্য দারোগাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার করে নিতে হয়েছে খবরগুলি।

আর আজ কিনা চারদিনের সেই অনাহারী মানুষটাকে—! নাঃ, কাজটা তাঁর মোটেই ঠিক হয়নি।

কিন্তু প্রমোশনের কথা মনে পড়লেই কেন যে মনটা অমন বিতি কিচ্ছিরি ভাবে খিঁচড়ে যায়! সেদিনও এই রকম খিঁচড়ান মনের তেজেই না লুকিয়ে মাছ খেয়েছিল শুনে সদ্যবিধবা সোমত্থ মেয়েটার গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিয়েছিলেন!

সত্য দারোগা ড্রয়ার থেকে সিগারেটের কেস বার করলেন। কেসে

সিগারেট বিড়ি দুই-ই আছে। বিড়ি, না সিগারেট—কি ধরাবেন কেস খুলে ভাবতে লাগলেন।

পাঁড়ে জল ঢালছে কালীনাথের মাথায়। তদারক করছে মুখুজ্জে। পাশে রাইফেলধারী বিনয়।

ওদিকে জামরুল তলার ভিড়টাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে কে যেন চাবকাচ্ছে! ছটফট করছে মানুষগুলি। থেকে থেকে দুয়েকটা হিংস্র মন্তব্য ঢিলের মত ছিটকে আসছে। নিজের কানের যন্ত্রণা ভুলে ওখান থেকেই বাপের জন্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছে লালু। বাপের কাছে আসবার জন্যে আথালি-পাথালি করছে, কে একজন তাকে আঁকড়ে ধরে আছে।

সিগারেটের কেসের উপর ঝুঁকে পড়ে সত্য দারোগা আড় চোখে জামরুল তলার দিকে তাকান। কাজটা তাঁর অন্যায় হয়ে গেছে, সত্যি অন্যায়, ভীষণ অন্যায়—কিন্তু তাই বলে ওই লোকগুলো ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমন তড়পাচ্ছে কেন? সাহস থাকে যদি, যদি মরদের বাচ্ছা হয় তো থানায় এসে হামলা করুক? কেন করছে না হামলা? উত্তেজিত জনতা এমন হামলা তো হামেশাই করে থাকে—ওরাও করুক! তবে না তিনি দেখিয়ে দেন মজাটা! কিন্তু আহা, হামলা কি ওরা করবে! যত সব ভীরু কাওয়ার্ডের দল। এখান থেকেই তিনি যদি রিভলভারটা উঁচিয়ে ধরেন--অমনি গুষ্টিশুদ্ধু হুড় হুড় করে গা ঢাকা দেবে। গুলি লাগলেও ঘুরে দাঁড়াবে না। জানোয়ার, সব জানোয়ার!

নাঃ,—ঝোঁকের মাথায়, পাছাল মশায়ের পরামর্শে গাঁয়ের

সত্যিকারের যোয়ান-মদ্দ মানুষগুলিকে এক খেপে টেনে তোলাটাই ভুল হয়ে গেছে। বড্ড ভুল। নইলে আজ হয়ত সত্যি সত্যি হামলা হত, তিনিও প্রস্তুত। 'কমিউনিস্টদের উস্কানীতে হিংস্র জনতার থানা আক্রমণ'—তারপর যতগুলো মরে মরুক ক্ষতি নেই। প্রমোশন তখন তাঁর আটকাত কে? কিন্তু হায়রে—ওই সব গরীব-গুর্বো খেতে-না-পাওয়া হাড়-টিংটিঙে মানুষগুলির কি সে তাগদ আছে? তাগদ না, সাহস? ঈস, কৃষক সমিতির ঘাঁটিটা তখন যদি অমন করে না উপড়ে ফেলতেন!

দু' আঙুলের ফাঁকে একটা বিড়ি নিয়ে রগড়াচ্ছিলেন সত্য দারোগা, বিড়িটা ফেটে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল।

'প্রাতঃপ্রণাম দারোগাবাবু।'

'আরে, আপনি! প্রণাম, প্রণাম। আসতে আজ্ঞা হক, আসুন আসুন। সকালবেলা পায়ের ধুলো—কি ব্যাপার?…চা?'

সস্মিত মুখে হেলতে দুলতে পাছাল মশায় বারান্দায় উঠে আসেন। মুখুজ্জে তাড়াতাড়ি উঠে তাঁকে চেয়ারটা এগিয়ে দেয়, নিঃশব্দে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানায়—মাথা নুইয়ে।

'চা? নাঃ—তবে যদি গিন্নির হাতের—'

'কি আশ্চর্য—কী যে বলেন! আপনাকে চা করে দেবে সে তো আমার শ্বশুরের ভাগ্যি!' হেঁ হেঁ করে সত্য দারোগা খানিক হেসে নেন।—'ওহে বিনয়, দু'কাপ চায়ের কথা বলে এসো। হ্যাঁ, ক্রুকবগুটাই যেন দেয়। যাও—হারি আপ।'

পাছাল মশায়কে আর কি করে অভ্যর্থনা জানাবেন বুঝতে না পেরে চেয়ারেই তিনি ছটফট করতে থাকেন।

কাশীনাথের জ্ঞান ফিরে এসেছিল। বাঁ বগলে রাইফেল ধরে, ডান হাতে একটি খাতা নিয়ে বিনয় তার মাথায় বাতাস করছিল। অসন্তুষ্ট মনে সে বড়বাবুর কোয়ার্টারের দিকে রওনা হয়।

কথা বলার ধরণ দেখনা রাস্কেলটার—যেন বাপের চাকর পেয়েছে! ওদিকে তো এই বয়েসে রাত দুপুরে প্রেমালাপের তোড়ে সেন্ট্রিরা চমকে যায়। কেন, নিজে একটু গলা ছেড়ে বলতে পারতিস না? পাঁড়ে ছিল না সামনে? চোখ তুলে তাকালেই তো ওই মেড়ো ব্যাটা পড়িমরি করে ছুটত হুকুম তামিল করতে। তা না, বিনয়। কত জন্মের পীরিত তার সঙ্গে! পেটের দায়ে না হয় সেপাই-ই আজ হয়েছে, তাই বলে যার তার সামনে এমন হুকুম ঝাড়বে নাকি? অশিক্ষিত ছোটলোক কোথাকার! সোয়াইন, সন্ অব এ বীচ—বিনয়ের দুই চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে—অথচ ও জানে না যে সে-ও এর প্রতিশোধ নিতে পারে, ভীষণ প্রতিশোধ। সদ্য সদ্য বিধবা হয়েও যেমন চনমনে ভাব ছুঁড়িটার, দেবে নাকি ফাঁসিয়ে? সত্য দারোগার মুখে চুনকালি মাখিয়ে দেবে নাকি? তার আর কি হবে কচু—বি-এ পাশ করেও যাকে সেপাইগিরি করতে হয়!

'কেলোটা বুঝি কাল—'

'আর কেন বলেন।' পাছাল মশায়ের কথা লুফে নেন সত্য দারোগা, 'সকাল থেকে ওই এক জ্বালায় জ্বলছি মশাই। পাড়ার লোকগুলোও হয়েছে তেমনি—বেশ তো বাবা, একটা লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছিস, বেশ করেছিস, ভগবান তোদের

ভাল করবেন—তা আগবাড়িয়ে থানায় খবর দিয়ে বাহাদুরী দেখানোর দরকারটা কি ছিল, অ্যাঁ? কী যে এখন করি!'

কালীনাথের দিকে সস্নেহে তাকান পাছাল মশায়।—'একি মতি হয়েছিল রে তোর—ছি ছি—এমন কাজ কখনো করে! ছি বাবা, ছি :—'

কালীনাথ উঠে বসল। পাছাল মশায়কে দেখে এখন যেন অনেকখানি জোর পেয়েছে। বুকের জোর, গলার জোর। কপালে দুই হাত ঠেকিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করল।

'কি করব মেজকত্তা, ও মাস থিকে ভরগুষ্টি আধপেটা খেয়ে ছেনু, তার ওপর চাদ্দিন একটা দানাও জোটেনে। ছেলে দুটো খালি কাঁদতে লাগল, বউটা দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে রইল, মোর পেটটাও—'

'তাই বলে এই কাজ। ছি বাবা, ছি!'

'আর যে সইতে পারনুনি গো মেজকত্তা'—ঝরঝরিয়ে কালীনাথ কেঁদে ফেলে, 'মোর মাথার ভেতরটাও যেন কেমনতরা হয়ে গেল—'

'আমার কাছেও তো একবার যেতে পারতিস, বাবা। আমার জমি তুই চাষ করিস, তোকে কি আমি না খাইয়ে রাখতুম, না রাখতে পারতুম? কাজটা বড্ড বে-আইনী হয়ে গেছেরে।'

কান্না থামিয়ে সজল চোখেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে কালীনাথ। বলে কি মেজকত্তা! দশ সের ধান কর্জের জন্যে কম করেও বিশ দিন ওঁর হাতে পায়ে সে ধরেনি? প্রথমে তার কথায় কান না দিয়ে, পারে মিষ্টিভাবে না করে, অবশেষে

দূর দূর করে ওকে তাড়িয়ে দেননি তিনি? তাহলে?
'যাক, যা হয়েছে হয়েছে।' পাছাল মশায় কেসে গলাটা সাফ করে নেন, 'এই নে একটা টাকা। আজকের দিনটা তো চালা, কাল সকালে একবার দেখা করিস।'
দলা-পাকানো টাকার নোটটি কপালে লেগে কোলের ওপর পড়ে। কালীনাথ থতমত খেয়ে সেটা তুলে নিয়ে ফের কপালে ঠেকায়। থতমত খেয়ে তাকিয়ে থাকে।
'এটা কর্জ নয়, অম্‌নি—অম্‌নিই তোকে দিলুম।' খানিক ভেবে পাছাল মশায় বলেন, 'ধানই দিতুম, কিন্তু কোথায় ধান? ধান কি আর এ তল্লাটে আছে! যাক, কাল একবার দেখা তো করিস—হিল্লে একটা করতেই হবে।'
এক টাকা দামের এক টুকরো কাগজ তো নয়—তিন পো চাল, লালু-দালুর মুখে হাসি, ভামিনীর সহজ সরল কথাবার্তা। আর নিজের—নিজের পেটের এই অসহ্য অকথ্য হর্দম পাক-খাওয়া যন্ত্রণাটার অবসান। হোক এক বেলার জন্যে, তবু তো এক বেলা! একটু অবেলা করে খেলেই রাতটা কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে বেশ কাটিয়ে দেয়া যাবে। আর দালু? সকাল সকাল ওকে ঘুম পাড়িয়ে ফেললেই নিশ্চিন্তি—অবুঝ শিশু বই তো নয়! তারপর কাল, হিল্লে কাল একটা হবেই। দারোগা বাবুর সামনে কথা দিলেন মেজকত্তা, এ-কথা তিনি রাখবেন—নিজের মান বাঁচাতেই রাখবেন। মেজকত্তার চিঠি নিয়ে এবার না হয় শহরের কারখানাতেই চলে যাবে। ভামিনী যাই বলুক, এভাবে উপোস করে মরার চেয়ে সে অনেক ভালো, হাজার ভালো। উপোস

করতে করতে ফের যে তার গলায় দড়ি দেয়ার মতি হবে না—কে বলতে পারে ?

নাঃ, কাজটা কালীনাথের তাহলে বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছিল—ভয়ানক অন্যায় কাজ, পাপ কাজ, বে-আইনী কাজ।

'যা, ফের বসে রইলি কেন ?'

'এজ্ঞে !' একবার পাছাল মশায় একবার সত্য দারোগার মুখের দিকে তাকায় কালীনাথ, 'যাব এজ্ঞে ? আমি তা'লে যাই ?' বারান্দার দেয়াল ধরে নিজের দেহটিকে টেনে তোলে।

সত্য দারোগা উসখুস করে ওঠেন, 'কিন্তু ডায়েরী ? ব্যাপারটা যে বড্ড জানাজানি হয়ে গেছে ! এখন ছেড়ে দিলে—'

পাছাল মশায় হেসে বলেন, 'বেশ তো, ডায়েরী করেই রাখুন না—হইচইয়ের ডায়েরী।' কালীনাথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'হ্যারে, বউটাকে কাল মেরেছিলি কেন ?'

'এজ্ঞে ! আমি আমি—'

'থাম ব্যাটা ! খবর আমি সব পাই—মেরেছিলি কিনা তাই বল্ ?'

গুম হয়ে থাকে কালীনাথ, মাথা হেঁট করে। ভামিনীকে কাল দুয়েক ঘা সে দিয়েছিল সত্যি, কিন্তু দিয়েছিল কি সাধে ! তার অত আদরের ভামিনীর গায়ে কত দুঃখে যে সে হাত তুলেছিল এরা তার কি বুঝবে ! ভামিনী কিন্তু বুঝেছিল, ঠিকই বুঝেছিল—বুঝেছিল বলেই না মার খেয়েও ফের আধেক রাত অবধি তারই বুকে এসে মাথা গুঁজে কেঁদেছিল, কালীনাথকেও কাঁদিয়েছিল। শুধু কাঁদা নয়, অনুতাপে আফশোষে মনটাও এমন বিগড়ে গিয়েছিল কালীনাথের যে ভামিনীকে বুকে চেপে ধরেই ভামিনীকে ছেড়ে

গলায় দড়ি দিয়ে মরার মতলবটা প্রথম জেগেছিল মনের মধ্যে। ভোরে আবার ভামিনীই চিৎকার চেঁচামেচি করে লোকজন জমায়, গাছের ডাল থেকে তাকে নামায়। তারপর অবিশ্যি তার সঙ্গে একটি কথাও আর বলেনি ভামিনী, সোজা গিয়ে ঘরে খিল দিয়েছে. এমন কি দাওয়া থেকে তাকে যখন পুলিশ গিয়ে ধরে নিয়ে এল, তখনও সে দরজা ফাঁক করেনি। আসলে এ কিন্তু রাগ নয়, অভিমান। দশ বছর বিয়ে হয়েও, দু ছেলের মা হয়েও, খেতে-পরতে না পেয়েও প্রথম বয়েসের অভিমান এখনও যায়নি বউটার। আহা রে! তিন পো চাল—বউয়ের মান! তিন পো চাল—লালু-দালুর মুখে হাসি! বুকটা আঁকপাঁকু করে ওঠে কালীনাথের—ছেলে দুটোকে আগেভাগে খাইয়ে দেবে—তারপর কোলে বসিয়ে নিজের হাতে খাওয়াবে বউকে। তারপর—

'আমি তা'লে যাই এজ্ঞে?' কালীনাথ ছটফট করে।

'দাঁড়া। কথাটার জবাব দিয়ে যা।'

মুখ নীচু করে সলজ্জ হেসে গাঢ় স্বরে কালীনাথ বলে, 'এজ্ঞে, তা গরীবের সন্‌সারে অমন ইকটু-আধটু—'

'চেলাকাঠ দিয়ে মেরেছিলি?'

'এজ্ঞে!' কালীনাথ আকাশ থেকে পড়ে, 'অ্যাঁ! বলেন কি মেজকত্তা?'

'মেরেছিলি মেরেছিলি—রাগের মাথায় মেরেছিলি, এখন কি আব হুঁশ আছে! তা গরীবের সংসারে সোয়ামীরা অমন মেরেই থাকে—ওতে কিছু হয় না—যা।'

'এজ্ঞে!'

'যা ব্যাটা!' পাছাল মশায় তেড়ে উঠলেন।
তাড়া খেয়ে উঠে দাঁড়ায়, হাঁটা শুরু করে কালীনাথ। কিন্তু চেলাকাঠ দিয়ে সে ভামিনীকে মেরেছিল? কবে? কোন্ জন্মে?
বিমূঢ় সত্য দারোগার দিকে তাকিয়ে পাছাল মশায় বললেন, 'হুইচইয়ের ডায়েরী তো? এই তো হয়ে গেল—স্ত্রী-শাসন, চেলাকাষ্ঠ ব্যবহার, তার পরিণামে—'
'কিন্তু ব্যাপারটা—'
'বড্ড জানাজানি হয়ে গেছে, কেমন? তা দরকার হলে যা হয় আপনার হয়ে কোর্টেও যাব।' গলা পরিষ্কার করে নিয়ে পাছাল মশায় বললেন, 'কংগ্রেসের একজন দীনসেবক হিসেবে সেটা তো আমার পরম কর্তব্য, দারোগাবাবু!'

ঘরের মেঝেয় দু' হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফোঁপাচ্ছে ভামিনী। তিন বছরের ছেলে দাসু মা'র কিনার ঘেঁষে বসে। কাঁদার কথা অবিশ্যি তারই,—খিদের কান্না, শেষ রাতে কাঁচা ঘুম ভাঙার কান্না। কিন্তু কান্না ভুলে ড্যাবডেবে চোখে সে চেয়ে আছে মা'র দিকে, আশেপাশের আর সকলের দিকে। কেবল একেকবার যখন মা'র বুকে মুখ গুঁজে দিতে যায় এবং ভামিনী ঝটকা মেরে সরিয়ে দেয়—তখনই শুধু কেঁদে ওঠে ছেলেটা।
'আহা, ওটাকে আর কাঁদাসনি বৌদি। দুধের বাচ্চা, কত আর সইবে! মাইটা দে।' কুন্তী সহানুভূতি জানায়।
ঘাড় নেড়ে অস্ফুটস্বরে সায় দেয় সবাই—ঘোষ গিন্নি, পচার পিসি, নিস্তারিণী, অষ্টমবালা, মধু সাপুয়ের মা। সেই সকাল

থেকে ওরা এসে বসে আছে, বেলা বেড়ে চলেছে, উঠি উঠি করেও ওঠা আর হয় নি। কেউ কেউ অবিশ্যি এসেছে খোঁজ নিয়ে চলে গেছে, এরা তা পারেনি। একেবারে পাশাপাশি ঘর—এ অবস্থায় কি করে একা ফেলে রেখে যায় বউটাকে? কালীনাথের মত ঠাণ্ডামাথা মানুষটা যদি অমন কাণ্ড করে বসতে পারে, তাহলে ভামিনীর মত একগুঁয়ে জেদী মেয়ে কি করে বসে তার ঠিক কি? তাছাড়া একবারও চেঁচিয়ে কাঁদল না, এ তো বড় ভালো লক্ষণ নয়! বারবার ফিসফিস করে অষ্টমবালা কথাটা সকলকে জানিয়ে দেয়, তার শ্বশুরের কথা মনে পড়িয়ে দেয়—বড় ছেলে সাপের কামড়ে মরাব পর একটুও হা-হুতাশ না করে চুপি চুপি যে রাতের বেলায় নিজের গলায় হাঁসুলীর পোচ টেনে চুপচাপই মরে থেকেছিল।

হনহন করে রাধা এসে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই ফেটে পড়ে, 'আশ্চয্যি আশ্চয্যি! থানার দারোগা কি মানুষ, না ঢ্যামনা!'

'কি কি—কী ব্যাপার?'

রাধা জবাব দেয়না কারো কথার। মুখ তুলেছে ভামিনী, তার মুখের দিকে তাকিয়েই সে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। ভামিনীর পাশ থেকে দালুকে টেনে আনে, একটি কাগজের ঠোঙা আর একটি শালপাতার মোড়ক তার হাতে গুঁজে দেয়।

মুখ ফুটে কিছু বলতে হয় না রাধাকে, দালু হুমড়ী খেয়ে পড়ে,—মুড়ি বেগুনি মেঝেময় ছড়িয়ে যায়।

'বেশ করিছিস রাধি, বেশ করিছিস। আম্মো ভাবছেনু, বাচ্চাটার মুখখানা কেমন শুক্কে গেছল—'

নিস্তারিণীর কথায় রাধা মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে, 'এঃ, আমি কিনিছি নাকি—কত্ত ট্যাকা! হেথা আসছেনু, বলাই মোর হাতদে পাঠ্যে দিলে। বললে, থানার সেপাইরা তো এসে রোজ মিনিমাগনা খেয়ে যায়, মোদের কালীদার ব্যাটাও নয় একদিন খাক।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে মুখ তোলে ভামিনী, রাধার চোখাচেখি হতেই সশব্দে কেঁদে ওঠে।

'কাঁদ, কাঁদ, কেঁদে কেঁদে মরে যা-না। তোরা তো কেবল মরতেই জানিস, গলার দড়ি দিয়ে মরতে, কেঁদে কেঁদে মরতে!'

মুখরা রাধার প্রতিটি কথায় বিষ ঝরে। মনে হয়, এই বুঝি সে চুলের মুঠি ধরে মাথাটা ভামিনীর মেঝেয় ঠুকে দেয়—যাতে সে ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। কিন্তু আগুনঝরা চোখ রাধার পরক্ষণেই জলে ভরে আসে, তাড়াতাড়ি সে পিছন ফিরে বসে। খুঁটে খুঁটে দালুকে মুড়ি খাওয়াতে শুরু করে।

চাপা স্বরে কুন্তী জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁ গো রাধাদি, থানার কথা কি যেন বলছিলে?'

'তোর তাতে দরকারটা কি শুনি? একপাল যোয়নমদ্দ ঠায় জামরুল তলায় দাঁইড়ে রইল, দেখেও রা কাড়লে না—তুই ছুঁড়ি শুনে করবি কি?'

'মেরেছে?' ভামিনী কঁকিয়ে ওঠে।

'না, জামাই আদর করেছে! থানার ঢ্যামনাদের তুমি জানোনা বৌদি? জানোনা?' তীব্রকণ্ঠে রাধা বলে, তীব্র চোখে তাকায়। তীব্রতর স্বরে আরো যেন কি বলতে যায়, হাঁফাতে হাঁফাতে লালু এসে ঢুকল।

'বাবা, বাবা—বাবা এসতেছে !'

'অ্যাঁ ?'

খবর দিয়েই উধাও লালু।

একসঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সকলে। যাক, মা শীতলা তাহলে মুখ তুলে চেয়েছেন। দু'চার ঘা যদি দিয়েও থাকে, তবু শেষ পর্যন্ত দারোগাবাবু ছেড়ে দিয়েছে।

'বাঁচনু বাবা।' পা ছড়িয়ে বসে কুন্তী।

'চলো গো সব, ওঠ ওঠ।'

'আর একটুন বস রাধাদি—'

'হ্যাঁ রাধি, আসুক আগে মানুষটা, একবার দেখি—'

'কেন, উনি কি সং নাকি যে সব ভিড় করে দেখবে ? চলো—'

রাধা নিজেই আগে উঠে দাঁড়ায় 'চলো সব, একটুন একা থাকতে দাও মানুষটাকে।'

আরও খানিকক্ষণ থেকে যাবার ইচ্ছে ছিল কুন্তীর—কালীদাকে দেখার, কালীদাকে দেখে ভামি-বৌদি কি করে দেখার সাধ ছিল। যার-তার সামনে বউকে সোহাগ জানায় কালীদা, আজও কি জানাত ? কি ধরণের সোহাগ সেটা ? আর সকলে চাইছিল, আসুক কালীনাথ, এসে দেখুক যে তার দুঃখে এরাও দুঃখী।—ঘরের কাজকর্ম ফেলে তোমার বউব্যাটাকে সকাল থেকে আমরা আগলে আছি। কিন্তু আমাদের অবস্থাও তো তুমি জান কালীনাথ, দুটো মিষ্টি কথার সান্ত্বনা ছাড়া আমাদের যে আর কিছুই দেয়ার নেই। সেই হ্যাঙ্গামার পর থেকে আমরা সবাই তোমায় একঘরে করেছিলুম সত্যি কথা—কিন্তু গাঁয়ের

মানুষ না খেতে পেয়ে গলায় দড়ি দিলে গাঁয়ের মানুষ আমাদের বুকও যে ফেটে যায় কালীনাথ!

কিন্তু রাধার কথার ওপর প্রতিবাদ করবে কে? একে একে সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। উঠোন গিয়েই রাধা আবার ফিরে আসে।

'একটা কথা তোকে বলি বৌদি—সোয়ামীকে কি ভাতের খোঁটা দেয়! দিন কাল কি পড়েছে দেখিস না চোখে? এত বুদ্ধি তোর—'

'মোর কথা আমি বলিনি ঠাকুরঝি, মোর কথা বলিনি! শুধু লালু-দালুর মুখ চেয়েই—'

'লালু-দালু কি তোর একার? কালীদা ওদের বাপ নয়কো? ওদের তরে তোরই শুধু বুক ফাটে, ওর ফাটে না?—চলি।'

'ঠাকুরঝি!'

'না, যাই এব্‌লা।'

রাধা চলে যেতেই ভামিনী ফের দুই হাঁটুতে মুখ গোঁজে। কাঁদতে থাকে ফুলে ফুলে। কালীনাথের আত্মঘাতী হতে চাওয়ার কারণটা নতুন করে মনে পড়ে। তার জন্যে গলায় দড়ি দেয় কালীনাথ, রাগের মাথায় কি একটা কথা মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে গিয়েছিল বলে? সারা গাঁয়ের লোকে জানল, বউয়ের জ্বালায় গলায় দড়ি দিয়ে মরা ছাড়া উপায় ছিল না কালীনাথের, এমনই দজ্জাল বউ সে তার স্বামীর! এর চেয়ে তারই কেন ওলাউঠোয় মরণ হল না? কেন হল না মরণ—কেন! কেন! মেঝেতে মাথা কোটে ভামিনী, মা শীত্‌লার

নাম নিয়ে প্রাণপণে মাথা কুটলেই যেন ওলাউঠোয় মরণ হয় মানুষের! হে ভগবান! হে মা শীত্লা! বাঁচতে আর সাধ নেই ভামিনীর। ঘেন্না! ঘেন্না! ইচ্ছে করলে কি সে বাপের বাড়ি চলে যেতে পারত না? জামাইয়ের অবস্থা শুনে এই সেদিনও তো তাকে নিয়ে যাবার জন্যে বাপ তার নিতাইকে পাঠিয়েছিল। রাজার হালে না থাকুক, বাপের বাড়ি গেলে সে অন্তত লালু দালুকে নিয়ে দুবেলা দুমুঠো খেতে পেত। কালীনাথের কথা ভেবেই না সে নানান অজুহাতে ভাইকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। আর আজ!—আজ কিনা গাঁ-শুদ্ধু সবাই জানল—ভামিনী ভাতের খোঁটা দেয় বলেই গলায় দড়ি দিয়ে মরতে গিয়েছিল তার স্বামী কালীনাথ! ধিক্ ধিক্—শত ধিক্ এমন জীবনে!

দোরগোড়ায় কালীনাথ এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল, ভামিনীর কাছ থেকে গুরুতর রকমের একটা সাজা পাবার আশায় যেন অপরাধীর মত মাথা নীচু করে প্রতীক্ষা করছিল—কিন্তু ভামিনীকে পাগলের মত মাথা কুটতে দেখে সে আর সইতে পারে না। তাড়াতাড়ি এসে হাত ধরে তুলতে যায় বউকে।

পলকের তরে মুখ তুলে তাকায় ভামিনী। স্বামীর ছোঁয়ায় তার দেহে মনে নতুন করে কান্নার জোরালো জোয়ার ওঠে। চাপা আর্তনাদের সঙ্গে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয়, তারপর কালীনাথের পায়েই মাথা কুটতে থাকে—'মর মর ভামি, মর তুই, মর তুই মুখপুড়ি—নিজের সোয়ামীকে খেতে গিইছিলি—মর মর মর!'

এ দৃশ্য একেবারে অপ্রত্যাশিত। কালীনাথ হকচকিয়ে যায়। আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ায় লজ্জাটাই তার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। আত্মহত্যার কারণ, এমন কি, খানিক আগের দারোগাবাবুর লাথিটার কথাও সে স্রেফ ভুলে গিয়েছিল। সেই লজ্জাতেই পথে কারো সঙ্গে কথা বলা দূরে থাক, মুখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারে নি। বরং সকলের সহানুভূতি শুনতে শুনতে ভেবেছিল—এভাবে জীবনভোর দেশশুদ্ধু মানুষের মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনার চেয়ে আরেকবার ভালোভাবে চেষ্টা করে গলার দড়ি দিয়ে মরে যাওয়াই ভালো।

'আঃ, লালুর মা! দোহাই তোর—ওঠ্‌ ওঠ্‌—এ্যাই, শুনচিস—'

'খুন কর মোরে, মোরে তুমি খুন করে ফেল—'

বিভ্রান্ত কালীনাথ অসহায়ের মত এদিক ওদিক তাকায়। মাথাটা তারও ঝিমঝিম করে ওঠে, দুই চোখ কেমন জ্বালা জ্বালা করে আসে। কোন মতে সে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে তক্তাপোষের ওপর ধপ করে বসে পড়ে।

দরজা দিয়ে একবার উঁকি মেরেই লালু সরে পড়ছিল, কালীনাথ ডাকল, 'এই লেলো, ইদিক পানে একবার আয় ত বাপ।'

ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে লালু ঘরে ঢোকে, যেন অজানা কোন বিদেশী মানুষের হুকুম তামিল করতে ঢুকছে এক অচেনা ঘরে। মেঝে থেকে দালু মুড়ি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, ঘরে ঢুকে ক্ষুধার্ত চোখে তাই দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে। দালুও যেন তার নিজের ভাই নয় যে থাবা মেরে এক মুঠো মুড়ি ওর সামনে থেকে তুলে নেবে।

ট্যাঁক থেকে কাগজের নোটটি বার করে কালীনাথ, 'যা তো বাবা, নদের দোকান ঠেঙে এক ট্যাকার চাল নে আয়—পারবি নি? এক খামচা নুনও চেয়ে নিবি, কেমন?'
'হিঁঃ।' দমকা হাসিতে সারা মুখ লালুর ভরে যায়। বাপের হাত থেকে টাকাটি প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বলে, 'অন্ন পিসির ঠেঙে ছুটি নাউশাকও চেয়ে নেসব বাবা, অ্যাঁ?' এবং অনুমতির অপেক্ষা না করেই চকিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।
বাপ ব্যাটার কাণ্ড দেখে কান্না থামিয়ে একটু উঠে বসেছিল ভামিনী, কালীনাথ আচমকা তাকে বুকে টেনে নিল। মা'র দিকে তাকিয়ে খাওয়া ভুলে দালু ডুকরে কেঁদে ওঠে, ভামিনী কাঁদে, কাঁদে কালীনাথও। এই রকম একটি কান্নার আশ্রয়ই যেন সকাল থেকে সে চাইছিল—পরম আরামে বউয়ের কাঁধে মুখ গুঁজে কেঁদে চলে যোয়ান মানুষটা।
কাঁদতে কাঁদতেই বলে, 'উনুনে আঁচ দে লালুর মা, উনুনে আঁচ দে—পেট পুরে ছুটি আজ খাই সবাই।'

সেই হাঙ্গামাটার পর থেকে কালীনাথের ওপরে গাঁয়ের সবাই বিরূপ হয়ে ছিল। ভাগচাষী কালীনাথ, আর আর সকলের মতই তার অবস্থা—পেট ভরে তো পরণে জোটে না, পরণে জুটল তো ওদিকে হরিমটর। তবু যখন সে কৃষক সমিতি থেকে সরে দাঁড়াল, বলল—ভগবান যা করে করবে, কপালে যা আছে হবে, কিন্তু কোন গোলমালে সে যেতে রাজি নয়, কারো দশে-পাঁচে নেই সে—তখন মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও

তবু তার একটা মানে সকলে বুঝেছিল। সহোদর ভাই কার্তিক বলেছিল, 'দাদাটা মোর বরাবর অমনতরা—মরদ নয়কো। মার খাবে, তবু হাত তুলে মারবেনি। দাদা মোর কলকেতার ভদ্দরলোক!' কালীনাথের আড়ালে সে খোঁটা দিতে ভামিনীকে, 'তোমার তরেই না দাদার মোর এমন দশা। কী তুকতাকই যে করেচ বৌদি—একেবারে ভেড়া বাইনে দিয়েচ।'

ভামিনী কখনও হাসত কখনও বা কপট ক্রোধে চোখ পাকাত। ক্রোধটা কপট হলেও আফশোষ একটা তার মনেও ছিল—সত্যিই তো, চাষীমরদের এমন হলে চলে! চাষীর ঘরের মেয়ে সে, সম্পন্ন চাষীর ঘরের, তবু তো দেখেছে তার বাপ দাদাদের সব সময়ে খালি এক ভাবনা—কি করে বাঁচবে, খেয়েপরে কি করে বাঁচবে? লাঙল হল গিয়ে লক্ষ্মীর বাহন, এই লাঙলে চেপেই ঘরে আসেন মা-লক্ষ্মী—লাঙল ছেড়েছ কি লক্ষ্মীও তোমায় ছাড়বেন। কিন্তু কালীনাথ, মাঠমুখো হওয়া দূরে থাক, দুবেলা দুমুঠোর জোগাড় হল তো তিন রাত্তির সে কাটিয়ে এল যাত্রার দলে। ভালো গাইতে পারে বলে নোনাপাড়া যাত্রা পার্টিতে বড় খাতির তার।

তা হোক তার যত খাতির—তাই বলে সংসার রসাতলে দিয়ে এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে গান গেয়ে বেড়ালে চলে নাকি মানুষের—ভাগচাষীর? রাগে টং হয়ে আছে ভামিনী, আজই একটা হেস্ত-নেস্ত করার জন্যে মুখিয়ে আছে—সারা রাত্তির না ঘুমানোয় ঢুলু ঢুলু চোখ, ঠোঁটের কিনারে পানের কস, কানের পাশে গলায় ঘাড়ে পেন্টের ছোপ, একমাথা উস্কোখুস্কো চুল—গুন্‌গুন করতে করতে

বাড়ি ঢুকল কালীনাথ, দাওয়ায় ভামিনীকে দেখেই গলা ছাড়ল —'পায়ে পড়ি বঁধুহে আর কোরনি মান, তোমার তরে ফাটে যে অবলার পরাণ—বঁধুহে—' ভামিনী তাড়াতাড়ি জিভ কেটে ঘরে গিয়ে ঢোকে। গলা আরও এক পর্দা চড়িয়ে কালীনাথও আসে পিছন পিছন। একি, সত্যি সত্যি পায়ে হাত দেবে নাকি মানুষটা? এই সক্কালবেলাই তাড়ি টেনে এসেছে নাকি?—আরে না না, তাড়ি না তাড়ি না—ভাব এসেছে কালীনাথের, মানভঞ্জনের সুর ভাঁজলেই ভাব এমন উথলে ওঠে। বিশ্বাস না হয়, আরেকটু কাছে আসুক লালুর মা, আরও একটু কাছে, মুখের কাছে মুখ এনে দেখুক পরখ করে।—মরণ! ফিক করে হেসে ফেলে কালীনাথের বন্ধন এড়িয়ে পালায় ভামিনী।

মুখে দাদাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করলেও মনে মনে কার্তিকেরও একটা গর্ব ছিল দাদা সম্পর্কে। শুধু ভালো গায় নয়, নিজেও ভালো গান বাঁধে কালীনাথ। 'মানভঞ্জন' পালাটা সাধন মাস্টারের নামে চললে কি হবে, ওর সব গানই কালীনাথের বাঁধা। কার্তিক তা জানে। কিন্তু মুখ্যু চাষীর বাঁধা গান টের পেলে ভদ্দরলোকেরা আসরে আসবে না বলেই প্রোগ্রামে ছাপা হয় সাধন মাস্টারের নাম—'শ্রীযুক্তবাবু সাধনচাঁদ মুখুর্জ্জে প্রণীত মানভঞ্জণ পালা'। সাধন মাস্টার ভদ্দরলোক কিনা! দাদা তার ভদ্দরলোক হলে এই গাঁয়ে থাকত নাকি পড়ে—কলকাতা থেকে থেটার-বাইস্কোপের লোকেরা এসে কোলে করে নিয়ে যেত না দাদাকে! পাছাল মশায়ের মেয়ে একদিন রেডিওতে গান

গেয়েছিল বলে হইচই পড়ে গিয়েছিল চারদিকে, সাতদিন আগে থেকে সারা গাঁয়ের লোককে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল সে-খবর, রেডিওর কলটা সেদিন বৈঠকখানার বারান্দায় এনে রাখা হয়েছিল —সবাই যাতে শুনতে পায়। শুনতে অবিশ্যি গিয়েছিল অনেকেই। কিন্তু গান তো নয় ইয়ে, একটা কথার মানে যদি কেউ বুঝে থাকে! বড়লোকের মেয়ে, কলেজে পড়ে, তার ওপর সুন্দর-পানা মুখটি দেখেই রেডিওর কর্তারা মজে গেছে। কিম্বা হয়ত ঘুষই দিয়েছিল পাছাল মশায়, ঘুষ দিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করা তো আজকাল অভ্যেস হয়ে গেছে লোকটার।

আর তার দাদা! তুলনা হয় না তার গানের। নেহাৎ চাষীর ঘরে জন্মেই জীবনটা তার বরবাদ হয়ে গেল।

মাঝে মাঝে বড়ঘরের দাওয়ায় এসে বসে কার্তিক। খানিক উসখুস করে বলে, 'এট্টা গান শোনাও দিকি, দাদা। মনটা বড় বিগড়ে আছে—'

'গান! তুই মোর গান শুনতে চাস?'

জাতে চাষীর ছেলে হলে কি হবে, জীবিকার জন্যে সবই করতে হয়। সন্ধ্যে হয়-হয়, উঠোনে দাঁড়িয়ে কালীনাথ জালের সূতোয় পাক দিচ্ছিল আর মনে মনে চেষ্টা করছিল নতুন একটি গান বাঁধার। সাধন মাস্টার রাবণবধের যে পালাটি বেঁধেছে তার সীতাবিলাপ অংশটা তেমন সুবিধের হয় নি। অথচ সীতাবিলাপ ভালো না হলে আসর জমবে না, লোকে কাঁদবে কখন? আবার সীতাবিলাপ থাকবে অথচ মা জানকীর দুঃখে সকলের বুক ফেটে চোখ দিয়ে জল গড়াবে না—এওকি কখনও

হয়? ওর থেকে ভালো যদি কিছু করা যায়, কদিন থেকেই সেই চেষ্টা করছে কালীনাথ। মনের মতটি কিছুতেই আর হয় না। মনটা তাই তার যারপরনাই মুষড়ে ছিল।

কার্তিকের ফরমাস শুনে কালীনাথ খুশিতে লাফিয়ে ওঠে, 'অ্যাঁ, মোর গান তুই শুনতে চাস কেতো? তোরও গান শুনতে মন চায়, অ্যাঁ!'

কার্তিক ক্ষেপে যায়, 'কেন, এতে দোষটা কি হল শুনি? মোরা মানুষ নই? গান শোনার সময় নাই-যে, নইলে ভাল গান ভালো না বাসে কোন শালা হে?'

সন্ধ্যায় শুরু হয়েছিল, আধেক রাত পর্যন্ত ছোট ভাইকে পাশে বসিয়ে কালীনাথ এক নাগাড়ে গান শুনিয়ে গেল। নিজের যন্ত্রটন্ত্র তার কিছু নেই। ছোটবেলায় একটা আড়বাঁশি কিনেছিল, কিন্তু যখন-তখন বাজাত বলে মা একদিন বাঁশিটা দু'খান করে উনোনে গুঁজে দেয়। সেই থেকে আর কোন যন্ত্র সে কেনেনি—প্রথমে কেনেনি অভিমানে, পরে হয়ে ওঠেনি অভাবে। আসরে গায় কন্সার্ট পার্টির সঙ্গে, এখানে গাইল খালি গলায়। প্রথমে কাকার কোলে এসে বসেছিল লালু, তারপর এল সরলা। ভামিনীর শরীরটা কদিন ধরে খারাপ হওয়ায় শুয়ে ছিল, এক সময় সে-ও এসে সরলার পাশে বসল। একে একে এল পাড়ার আরও অনেকে। কৃষক সমিতির লোকেরা এসেছিল কার্তিকের ঘরে মিটিং করবে বলে, ধূলোভর্তি উঠোনেই সব বসে গেল। ভিড় দেখে তখন দাওয়া থেকে উঠোনে নামল কালীনাথ, ঘুরে ফিরে হাত মুখ নেড়ে নেড়ে গাইতে লাগল। এবং আধেক রাত পর্যন্ত জন

তিরিশেক মেয়ে-পুরুষকে কাঁদিয়ে হাসিয়ে রাগিয়ে, সকলের বুকের মধ্যে আবেগের তীব্র আলোড়ন জাগিয়ে দিয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে না খেয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। দেহ-মন তখনও তার থরথর করছে, খিদে তেষ্টা উবে গেছে।

অমন হয় গো, অমন হয়—মন প্রাণ দিয়ে দেবতার কথা গান করে গাইলে দেবতা নিজেই এসে ভর করেন গায়কের দেহে। কারো সাথে তখন কথা কইতে মন চায় না, পৃথিবীর আর কিছুই তখন ভালো লাগে না—এমন কি বেহায়ার মত উদোল গা'য় ভামিনী নিজে থেকে এসে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেও আপনা হতেই হাত দুটো তাকে সরিয়ে দেয়।

সমিতির রায়বাবু একদিন বললেন, 'তুমি এত ভালো গান বাঁধতে পার কালীনাথ, এত মিষ্টি গলা তোমার, তা দেশের অবস্থা তো দেখছ—এসব নিয়ে একটা পালা বাঁধনা? আগে ছিল গিয়ে তোমার এক রাবণ, আজ হয়েছে অগুণতি। এদের বধের—'

কথার মাঝখানেই যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে হাত জোর করে কালীনাথ বলে, 'ওই কথাটি কোয়োনি বাবু,—আচ্ছা আচ্ছা কমরেড—ওই কথাটি কোয়োনি কমরেড। মুখ্যু মানুষ, লেখাপড়া জানিনি—গান বাঁধার সাধ্যি কি মোর! গান বাঁধেন তিনি, তাঁর কথাই তিনি গানের সুরে মোর মুখ দে বলান—আমি তো নিমিত্ত মাত্তর!'

মাঝে মাঝে ওই এক কথা বলত কার্তিকও। কালীনাথ কান দিত না। কখনও বা দেবতার কথা তুলত। কখনও বলত, 'দাঁড়া দেখি, এট্টু ভাবতে দে—মোকে এট্টু ভেবে দেখতে দে।'

' ভাবতও, নাছোড়বান্দা কার্তিকের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কালীনাথ ভাবত। কিন্তু বাইরের চোখে-যে সে দেখতে পায় না, দেখে-যে শুধু মনের চোখে—তার কি? সব ভাবনা-যে তার দেবদেবীদের ঘিরেই কেবল পাক খায়—তার কী করবে কালীনাথ? কার্তিকের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়—না না, এতো কার্তিক নয়, কেতো নয়—এ যে কুশ! কুশ! ছোট ভাই কুশ প্রতীক্ষাব্যাকুল মুখটি তুলে চেয়ে আছে বড় ভাই লবের দিকে—রামায়ণ গানের প্রথম কলিটি লব গাইলেই সুর ধরবে বলে।

'গান শুনবি কেতো, রামা'ণ গান? নতুন বেঁধিচি, শুনবি?'

'নিকুচি করেচে তোমার গানের!' কার্তিক বিরক্ত হয়ে উঠে যায়।

এরই দিন কয়েক পরে ঘটল সেই মর্মান্তিক ঘটনা। ভেতরে ভেতরে কি-যেন একটা গোলমাল চলছিল, কালীনাথ আভাষে-ইঙ্গিতে কিছু কিছু টেরও পেয়েছিল, কিন্তু ভালো করে ব্যাপারটা সে জানত না, জানবার কোন গরজও ছিল না। লবকুশকে নিয়ে বাঁধা তার পালাটার খুব নাম হয়েছিল, পাছাল মশায়ের নাকি সেটা এত ভালো লেগেছিল যে নিজে থেকে তিনি ডোমজুড়ে তাঁর বেয়াইয়ের বাড়িতে বায়না ঠিক করে দিলেন। শুধু তাই না, যাওয়ার ভাড়া বাবদ সাধন মাস্টারের হাতে নিজেই আগাম দশটা টাকাও দিলেন গুঁজে।

ফেরার কথা ছিল পরের দিন, কিন্তু ফিরতে দেরী হয়ে গেল আরও দুদিন। গোটা তিনেক মেডেল, নতুন উড়ুনী, নগদ পাঁচ টাকার নোট একটা—রাগে অভিমানে টং হয়ে আছে

ভামিনী, তা থাকুক—এসব দেখে মুখে তার হাসি না ফুটে পারবে না। সারা পথ কালীনাথ ভাবের ঘোরে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এল।

কিন্তু গাঁয়ে ঢুকেই অবাক। শীতলাতলায় মহেন ঘোড়ুইয়ের সঙ্গে দেখা। কালীনাথ হাঁক ছাড়ল—'বলি ও মহেনদা'—। চমকে একবার ফিরে তাকাল মহেন, তারপর হনহনিয়ে চলে গেল বাঁশবনের পথ দিয়ে। কি ব্যাপার? আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু তাকে দেখেই ঝটপট মুখ ঘুরোল সকলে, কেউ কেউ সরাসরি দিল গা-ঢাকা। বারোয়ারীতলায় জোরদার একটা আলোচনা চলছিল, কালীনাথ কাছে আসতেই সব চুপ। ব্যাপার কি? ব্যাপার কি? বাড়িতে কারো কিছু হয়নি তো? প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে পৌছল কালীনাথ।

না, তার কিছু হয়নি!

তার মা, তার ভামির না, তার লালুর না, তার ছ'মাসের শিশু দালুরও না। তার সব ঠিক আছে!

শুধু পশ্চিমের দিকের ছোটঘরটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে মাটির দেয়ালকে মেশান হয়েছে মাটিতে, ছাদের খোলা-কুচি, দরজা-জানলা, বিছানাপত্তর সব ছত্রছান চারদিকে।

তাকে দেখে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল ভামিনী।

তার আসার খবর পেয়ে নবতারার কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে এসে দাঁড়াল সরলা। ভিড় করল আরও কয়েকজন।

ভাসুরের সামনে কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়ায়নি যে-মেয়ে, আজ

মাথার কাপড় ছুঁড়ে ফেলা যা নয় তাই বলে সে গালাগাল দিল কালীনাথকে। চারপাশ থেকে সবাই ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে উৎসাহ দিল, উস্কে দিল! বিমূঢ় কালীনাথের এককেবার এমনও মনে হয়েছিল এই বুঝি সরলা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁতে নখে ছিঁড়ে তাকে টুকরো টুকরো করে দেয়। দাউ দাউ আগুন জ্বলছে সকলের চোখে—রাগের নয়, ঘৃণার আগুন—রাগের চেয়েও যা অসহ্য।

কারো কোন কথার জবাব দেয়নি কালীনাথ, কোন অভিযোগের প্রতিবাদ করেনি। পুরো দুটো দিন বিছানায় মুখ গুঁজে থেকে শুধু ভেবেছে—কি করে গাঁয়ের লোকেরা ভাবতে পারল যে সে-ই সব সুলুক-সন্ধান দিয়েছে কৃষক সমিতির, পাছাল মশায়ের সঙ্গে যোগসাজসে সে-ই করিয়েছে এই সব কাণ্ড—ঘরদোর ভেঙেছে কার্তিকের, কার্তিকের ঘরে কৃষক সমিতির লুকিয়ে-থাকা নেতাকে ধরিয়ে দিয়েছে! নিজে উপস্থিত থাকলে পাছে চক্ষুলজ্জা এসে বাধা দেয়, তাই পাছাল মশায়কে দিয়ে বায়না আনিয়ে ডোমজুড়ে সরে পড়েছে, একদিনের জায়গায় তিনদিন সেখানে কাটিয়ে এসেছে! হতে পারে কৃষক সমিতির গোলমালে সে যেতে চায়নি, কিন্তু তাই বলে ছেলের মত ভালোবাসত যে ছোট ভাইটাকে তাকে সে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে? নিজে পছন্দ করে তিন কুড়ি টাকা পণ দিয়ে যে সরলাকে সংসারের ছোট লক্ষ্মী করে এনেছিল, পুলিশ লাগিয়ে সেই সরলার ওপর অত্যেচার করিয়েছে—কালীনাথ? মা বলে ডাকত যাকে, নতুন পোয়াতি সেই সরলা মায়ের পেটের ছেলে নষ্ট করিয়েছে সে?

ভাবতে পারল ? গাঁয়ের লোকেরা না হয় পর, কিন্তু তার সরলা মা, তার লক্ষ্মণ ভাই কেতো ভাবতে পারল একথা ?

ভাবতে ভাবতে কালীনাথের মাথাটা একেবারে খালি হয়ে যায়। না, এ পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নেই, কেউ না। কেউ তাকে বুঝল না, তার বাপ না মা না ভাই না—ভামিনী-সরলা তো পরের মেয়ে। মাথার ওপরে ভগবান নেই—কেউ নেই কিছু নেই পৃথিবীতে। এই গাঁয়ে সে আর থাকবে না—একঘরে হয়ে মানুষ কি করে থাকে বাপ পিতাম'র ভিটেয় ? যে দিকে দুচোখ যায় চলে যাবে। না, গানও আর গাইবে না—চাষীর ঘরে যখন জন্মেছে, লাঙল ঠেলেই জীবন কাটাবে। তবু এ দেশে নয়, অন্য দেশে—অনেক দূরের কোন দেশে গিয়ে ফের নতুন জীবন শুরু করবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই সে করতে পারল না—বড় দুর্বল মন কিনা কালীনাথের ! ভিটে ছেড়ে যাবার কথা ভাবলেই বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে, বেঁকে দাঁড়ায় মন। ভামিনীও যেতে রাজি নয়, ভামিনীকে ছেড়ে সে বাঁচবে কি করে ? কদিন থাকতে পারবে লালু দালুকে না দেখে ? মরতে হয় এখানেই মরবে, এই ভিটের মাটি কামড়ে থেকে—তবু এ গাঁ ছাড়া অসম্ভব। গাঁয়ের লোক তাকে দেখে মুখ ফেরায় ফেরাক—কিন্তু এই গাঁয়ের প্রত্যেকটি গাছ প্রতিটি ধূলিকণা যে তার অতি আপনার জন। আগের মত আজো তারা ঠিক তেম্নি আছে—তারা তো আর মানুষ নয়, তাই ঠিক বুঝেছে কালীনাথকে। অবিশ্যি এই জমির স্বত্ব পাছাল মশায়ের, তিনি যদি উচ্ছেদ করেন তাহলে নিরুপায়।

যে যাই বলুক, দাঙ্গাহাঙ্গামা, হইহুজ্জোত করা তার ধাত নয়—হাজার বললেও সে তা পারবে না। সে তো পৃথিবীতে বড়লোক মহাজন হতে চায় না, সে শুধু চায় দুবেলা দুমুঠো খেতে, বউছেলেকে খাওয়াতে। মাথা গোঁজবার একটু আশ্রয় পেতে। আর, আর—না না, গান আর গাইবে না কালীনাথ!

পাছাল মশায় যদি উচ্ছেদ করেন গাছতলায় দিয়ে দাঁড়াবে—জেল থেকে কেতোর ফেরার প্রতীক্ষা করবে। সরাসরি কার্তিকের মুখ থেকেই কালীনাথ শুনতে চায় তার সম্পর্কে কি ভাবে তার লক্ষ্মণ ভাই। কার্তিক যদি বুকে আসে গাছতলাতেই তাহলে ফের নতুন সংসার গড়ে তুলবে। কার্তিক যদি মুখ ফেবায়—গাঁ ছেড়ে চিরকালের জন্যে চলে যাবে।

কিন্তু উচ্ছেদ করা দূরে থাক, দিন কয়েক পরেই পাছাল মশায় তাকে ডেকে পাঠালেন। অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেন, দুঃখ জানালেন, আফশোষ করলেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন কৃষক সমিতি করা যে কত বড় পাপ ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন সেই কথা। আর প্রতি কথার ফাঁকে ফাঁকে তারিফ করলেন কালীনাথের গানের—আহা, কালীনাথ ধাড়ার মত কবিয়াল যদি এ তল্লাটে আর থাকে!

'যাক, শোন এবার কাজের কথা। তোর আর কেতোর ভাগে জমি ছিল, তুই তো মাঠমুখো হতিসনি, এবার থেকে তোর জমি তুই-ই চষ, বুঝলি? সংসারে মন দে। গানও গা অমনি—'

ঘাড় কাৎ করেই ছিল কালীনাথ, সায় দেবার জন্যে নতুন করে

আর নাড়তে হয়নি। কথাটা পাছাল মশায় বলেছেন ঠিক—সত্যি, আর তো কেতো নেই, এখন থেকে সব ভারই তাকে বইতে হবে। নামেই শুধু চাষীর ছেলে কিন্তু এতদিন জানত না কত ধানে কত চাল হয়। এবার জানতে হবে, সব কিছু শিখে পড়ে নিতে হবে। বাঁচতে হবে, নতুন করে বাঁচতে হবে, চাষী হয়ে বাঁচতে হবে। সরলাকে তার বাপ এসে নিয়ে গেছে, তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আজ আসতে না চা'ক, একদিন নিশ্চয়ই আসবে, কার্তিক জেল থেকে ফিরলেই আসবে। ততদিনে কালীনাথ নতুন করে ঘর তুলে দেবে কার্তিকের, সেই ঘরে নতুন করে বরণ করে তুলবে কার্তিক আর সরলাকে—যেমন একবার তুলেছিল। তখন তবু অভাব ছিল, এবার তা থাকবে না, থাকতে দেবে না কালীনাথ। দিনরাত মেহনত করবে,—মাঠে মেহনত, ঘরে মেহনত। গান গাওয়ার বদলে জাল বুনবে, চ্যাটাই বুনবে, জন খাটবে। এমন স্বচ্ছল করে তুলবে সংসার যে জেল থেকে ফিরে সব দেখে-শুনে হকচকিয়ে যাবে কার্তিক। বুঝবে যে কৃষক সমিতি নিয়ে হইহট্টগোল করলে কিছু হয় না, গতর খাটাতে হয়। চাষী নিজে গতর খাটালে মা-লক্ষ্মী আপনা হতেই তাঁর ঝাঁপির মুখ খুলে ধরেন।

সংসারে মন দিল কালীনাথ। মনটাকে দুভাগ করে এক হাতে একটি মনের টুঁটি টিপে ধরে আরেক হাতে হাল ধরল সংসারের।

এবং শুরু হল অর্ধাহার—অনাহার।

উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও দুবেলা ভাত জোটেনা। মাঠ থেকে

যে ফসল ওঠে, ঘরে আসে তার অর্ধেক। ঠাকুর্দার আমলে নাকি ঋণ নেয়া হয়েছিল,—চক্রবৃদ্ধিহারে সে-ঋণ এখন বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে—তবে মহাজন বিবেচক লোক, আসল চায় না, সুদ হিসেবে মণ কয়েক ধান পেলেই খুশি। তারপর আসে ধানধরা বাবুরা—খোরাকির নামে কিছু রেখে চোখের সামনে গাড়ি বোঝাই করে। কড়কড়ে কয়েকটা কাঁচা টাকা হাতে নিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কালীনাথ। নগদ টাকা পেয়ে খুশি হতে চায়। কিন্তু মাস যেতে না যেতেই খোরাকির ধানে টান পড়ে—নদের দোকানে চালের দাম তখন চল্লিশ।

অবাক কাণ্ড! অবাক কাণ্ড! শ্রীকৃষ্ণের অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য কাহিনী মুখস্থ কালীনাথের—কিন্তু এমন অবাক তাজ্জব আশ্চর্য কাণ্ডের কথা সে জন্মে শোনেনি।

আর কার্তিক!

ভাবতেই দম বন্ধ হয়ে আসে কার্তিকের মুখটা আবছা আবছা হয়ে যায়, কিন্তু কথাগুলি তার স্পষ্ট মনে পড়ে। কোথায় আজ কার্তিক—তার বাপ-মা মরা ছোট ভাইটি?

আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জবাব খোঁজে কালীনাথ। বাড়ি-ঘর ভেঙে-চুরে বউটাকে বেইজ্জত করে যোয়ান সোমত্থ যে ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে গুলি করে মারা হল—কোথায় গেল সে? লোকে বলে, শহীদ হয়েছে কার্তিক, —কেতো তার স্বগ্যে গেছে। উদয়াস্ত মেহনত করেও বউছেলে নিয়ে দিনের পর দিন কেন তাকে উপোস দিতে হয়—স্বগ্যে গিয়ে সেই কথাটা একবার শুধিয়ে আসবে নাকি কেতোকে?

খিদের জ্বালা ভুলেও কালীনাথের মনটা যখন-তখন হু-হু করে ওঠে। জল ঝরে না, জ্বালা-জ্বালা করে দুই চোখ। অকথ্য যন্ত্রণায় বুকটা চৌচির হয়ে যেতে চায়।

কি যেন, কি যেন কথাগুলি বলত কার্তিক? স্বগ্যে গিয়ে কথাগুলি ফের শুনে আসবে নাকি কালীনাথ?

ভামিনীর সঙ্গে ছুতোনাতায় ঝগড়া বাধিয়ে যাবে নাকি চলে, মা-বাপ মরা ভাইটির কাছে—বাপ বলে ডাকা যায় যে-ভাইকে?

অ্যাঁ! হঠাৎ ভামিনীর মুখটা অমন হয়ে গেল কেন? কি বলেছিল কালীনাথ যে ভামিনী হঠাৎ অমন ফোঁস করে উঠল? তার বুক থেকে ছিটকে গেল?

ঘুমন্ত দাল্লুকে কোলে নিয়ে জানলা দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে পাশের ডোবাটার দিকে কালীনাথ তাকিয়েছিল, নদের দোকান থেকে লাল্লু ফিরে এল। তিন পোর বদলে এক টাকায় এক সের চাল দিয়েছে নদে। শুধু এক খামচা নুন নয়, সেই সঙ্গে মাটির খুরিতে করে খানিকটা তেল, কয়েকটা আলু, দুটো পেঁয়াজ, চারটি শুকনো লঙ্কা এবং পোয়াটাক ডালও এনেছে লাল্লু। অতগুলি জিনিস সামলাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে ছেলেটা।

'ধর ধর, শিগগীর ধর।'

চালের ঠোঙার ওপর কালীনাথ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। হাত দিয়ে মুঠো করে ধরে এক খামচা চাল—হ্যাঁ, ঠিক—চালই বটে!

'দ্যাখসে লাল্লুর মা, দ্যাখ দ্যাখ—'

ভামিনী দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল, জবাব না দিয়ে মুখ

ঘুরিয়ে চলে গেল। কিন্তু ভামিনীর মুখ দেখবার মত ফুর্সৎ এখন নেই কালীনাথের—এক টাকায় এক সের চাল দিল নদে? তা ভাল তা ভাল, কিন্তু—

'কিন্তুক ইগ্‌লো? ইগ্‌লো?'

'ইসব মাগনা বাবা, সব মাগনা। আলুর পয়সা দিলে পণ্ডিত মাশা, তেল কিনে দিলে বিশু কাকা, ডাল বদুর বাপ। আর নঙ্কা প্যাঁজ নদে জ্যাঠা অম্নি দিলে! হ্যাঁগো অম্নি, মাগনা! আমি কারো ঠেঙে চাইনি, দোকানে সবাই ছেল—মোর হাতে তুলে দিলে! বিশ্বেস না হয়'—এক নিশ্বাসে সব বলতে গিয়ে হাঁফ ধরে যায়, কথা থামিয়ে লালু হাঁফাতে থাকে।

আর অবাক চোখ দুটি কালীনাথের জলে এবার ভরে আসে। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এই সব তার পড়শী—কানা পণ্ডিত, বিশু সাপুই, বদুর বাপ হরি ঘোষ! কানা পণ্ডিত মাইনে পায় চার টাকা, আড়তে খাতা লিখে সংসার চালায়। তারই মত ভাগচাষী বিশু সাপুই, পঞ্চাশ বছরের বুড়ো হরি ঘোষকে আজো জন খাটতে হয়। একদিন এই মানুষগুলির কাছেই কবিয়াল কালীনাথের খাতির ছিল অগাধ, এই মানুষগুলিই একদিন একঘরে করেছিল তাকে—আবার এই মানুষগুলিই আজ নিজেদের খিদের গ্রাস তুলে দিল তার হাতে! বড় শক্ত, মানুষ চেনা বড় শক্ত!

চিরদিন শুধু দেবদেবীদের কথাই ভেবেছে কালীনাথ, মানুষের দিকে তো আর তাকায়নি, তাই মানুষকে সে চিনতে আজও পারল না। মানুষ আসলে লোক ভালো, সব মানুষই—শুধু অবস্থার ফেরে

এদিক ওদিক হয়ে যায়—এই যা। নইলে এই ভিটের মায়া ছেড়ে লাল্লু দাল্লু ভামিনীকে অকূলে ভাসিয়ে সে গলায় দড়ি দিতে যায়? না খেয়ে কি কালীনাথ একাই আছে? গাঁয়ের কোন চাষীর ঘরে আজ দুবেলা ভাত জোটে? বাঙালরা প্রাণের ভয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল, কিন্তু দখিণ-পাড়ায় তারাই এখন মড়কে মরছে—না খেতে পেয়ে রোগে ভুগে ভুগে মরার মড়ক! এ-গাঁয়ের ও-গাঁয়ের সে-গাঁয়ের সব গাঁয়েরই এক দশা। এর জন্যে দেশশুদ্ধ লোক যদি গলায় দড়ি দেয় তাহলেই সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে নাকি? বাপেরা মরলে ছেলেরা থাকবে না? ছেলেরা মরলে নাতিরা? এই ভাবে বংশ বংশ ধরে চলবে না এই না খেতে পেয়ে গলায় দড়ি দেয়ার পালা যদি না এর একটা বিহিত হয় সময় থাকতে?

বিহিত! কি বিহিত?

আরও যেন কি কি বলত কার্তিক? কার্তিকের মুখখানি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু বিহিতের কথায় কি যেন বলত কার্তিক?—কি যেন—?

'মা উনুনে আঁচ দিচ্চে বাবা!'

'অ্যাঁ! আঁচ দিয়েচে? ও, ছায়নে, দিচ্চে? বেশ বেশ—তোর বড্ড খিদে পেয়েচে, নারে?'

খিদে পাওয়ার প্রশ্নে চার দিনের উপোসী আট বছরের ছেলেটাও লজ্জা পায়, কেমন যেন অপরাধ বোধ করে। করুণভাবে একটু হেসেই ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। দোকান থেকে আসবার সময় কয়েক দানা চাল লাল্লু মুখে

পুরে দিয়েছিল, বড় ভালো লেগেছিল চিবুনো চালের রসটুকু। কিন্তু তখন কি আর জানত যে ওই কটি চাল পেটে গিয়ে খিদেটাকে এমন চাগিয়ে তুলবে? অবিশ্যি এখনও আরও দুমুঠো চাল অনায়াসে মুখে পুরে সে দিতে পারে। কিন্তু না, চাল না,—উনোনে আঁচ দেয়া দেখে ভাতের কথা মনে পড়ে গেছে তার, ভাতের জন্যে প্রাণটা এখন খাঁ খাঁ করে উঠেছে। কত জন্ম যেন ভাত খায়নি, কেমন যেন স্বাদ ডাল দিয়ে মেখে আলু-চচ্চড়ির্র সাথে গরমগরম ভাতের গ্রাস চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়ার!

'আলু দিয়ে চচ্চড়ি হবে, না বাবা?' বারান্দায় খানিক পায়চারী করে লালু ফিরে আসে।

'চচ্চড়ি? বেশ বেশ—চচ্চড়িই!'

'এ্যাইরে!'

'কি? কি?'

'তোমায় যে মেজকত্তা এক্ষুণি ডেকেচে গো—'

'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ গো। ভ্যাবলা আসছেল, দোকানে মোকে দেখে বলে দিলে।'

'অ্যাঁ, আর সেই কথাটা তুই এতক্ষণ ধরি বলিসনি হারামজাদা! কখন যেতে বলেচে? এক্ষুণি?'

লালু ঘাড় নাড়ে।

তাড়াতাড়ি কালীনাথ উঠে পড়ে। দালুকে তক্তাপোষে শুইয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরোয়।

ইচ্ছে ছিল হেঁসেলের কাজে একটু সাহায্য করে ভামিনীকে। হেঁসেলের পাট তো উঠেই গিয়েছিল, বড় জঞ্জাল জমে গেছে ঘরটায়। একা একা কাজ করতে উপোসী বউটা হয়ত খাবি খেয়ে যাচ্ছে, সে ও একটু গিয়ে হাত লাগায়। এমন একটা মহোৎসবে কালীনাথ নিষ্কর্মার মত বসে থাকে কি করে? শুধু নিষ্কর্মার মত বসে থাকার কথা নয়, সে হাত লাগালে রান্নার কাজটাও তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। চাল দেখে এমন ছেলেমানুষের মত খিদেটা উথলে ওঠে উপোসী জোয়ান মানুষেরও! কিন্তু লালুর কথা শুনে আর স্থির থাকা চলে না। ছেলেটাও এমন বোকা,—বলতে ভুলে গিয়েছিলি বেশ করেছিলি, খাওয়া দাওয়ার পরে কথাটা মনে করলেই হত। বিকেল নাগাদ যাওয়া যেত মেজকত্তার কাছে। লালুর ঘাড়েই দোষটা চাপিয়ে দিতে পারত,—ছেলেমানুষ, তারপর কদিন খাওয়া নেই—ওর পক্ষে ভুল হওয়া আশ্চর্য কি! তা না—।

'মেজকত্তা ডেকেচে, শুনে আসি।'

মাথা হেঁট করে ভামিনী উনোন থেকে ছাই বের করছিল, কথা বলল না।

'শুনছিস লালুর মা—'

'আমি কি কালা না কুঠে!'

থ হয়ে যায় কালীনাথ। ভামিনীর স্বর শুনে খানিক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হল কি মাগিটার? হঠাৎ মেজাজটা এমন তিরিক্ষি হয়ে গেল কেন?

'ওদিকে তলব হয়েছে, শুনে আসি'—কৈফিয়তের সুরে কথাগুলি

বলে অবাক মনে ভাবতে ভাবতে গুটি গুটি পা'য় কালীনাথ বেরিয়ে যায়।

ভেবেছিল জরুরী কথা যখন দু'মিনিটেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কালীনাথের ফিরতে দেরী হয়ে গেল ঘণ্টা তিনেক। রোদ্দুরে চারদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে, খিদেতেষ্টার আর বোধ নেই তেমন। না খেয়ে খেয়ে একটা অভ্যেস হয়ে গেছে—দুপুরে একবার আর রাত্তিরে একবার খিদেটা ভীষণ ভাবে চাড়া দিয়ে ওঠে। সেই সময়টুকু কোনমতে কাটিয়ে দিতে পারলে বাকি সময়টা তেমন আর কষ্ট হয় না। মাথাটা কেবল ঝিম-ঝিম করে, শরীরটা শুধু বড় বেশী হালকা মনে হয়—এই যা। নইলে না খেয়ে থাকায় আর কষ্ট কি! হাঁটতে গেলে অবিশ্যি থেকে থেকে দুই চোখে আঁধার ঘনিয়ে আসে—এই এখন যেমন আসছে।

কিন্তু না, এ আঁধার আর থাকবে না। উঁহু, থাকবে না। কার্তিক বলত আঁধার রাতের পর দিন হয়—কালীনাথের আজই শেষ আঁধার রাত, কাল তার দিন হবে। কার্তিকের কথা শুনে হবে না, কার্তিকের কথা শুনলে হতও না—পাছাল মশায়ের কথা শুনেই হচ্ছে।

পাছাল মশায়ের কথাই শুনবে কালীনাথ। কালই সে চলে যাবে শহরে, ভামিনীদের নিয়েই যাবে। শহরে পাছাল মশায়ের কারখানায় কাজ করবে, থাকার জায়গাও ঠিক করে দেবেন পাছাল মশায়। কি হবে আর ভিটের মায়ায় পড়ে থেকে? তাছাড়া, তার পক্ষে এখন গাঁয়ে থাকাও বড় লজ্জার কথা।

কথাগুলি পাছাল মশায় বলেছেন ঠিকই। আসলে মানুষটার দরদ আছে তার ওপর, সেটা আজ স্পষ্ট বোঝা গেল। নইলে অমন মান্যগণ্য মানুষ কখনো সাধারণ একটা হাভাতে চাষীর জন্যে এত করে। কালীনাথ মুখ্যু মানুষ কিনা, তাই এতদিন কিছু বোঝেনি।

আকাশের দিকে তাকায় কালীনাথ, ইস্, বড্ড দেরী হয়ে গেছে! কিন্তু কি করা!

কথায় কথা উঠল, বড় বড় ভারী ভারী কথা—বাকি সকলের সঙ্গে পাছাল মশায় সেই সব কথা কইতে লাগলেন। কালীনাথ অবিশ্যি তার কিছু বোঝেনি, কিন্তু তাকে নিয়েই যখন এত কথা, তখন বুঝুক না বুঝুক শোনার ইচ্ছে তার থাকুক না থাকুক—চোখ দুটি বড় বড় করে হাঁ করে পায়ের কাছটিতে থাকতে হয় বইকি বসে! বাড়ির কথা মনে পড়লেও, খিদেয় পেট জ্বলে গেলেও—হয়।

দাওয়াতে চিৎ হয়ে ঘুমুচ্ছে লাল্টু। ভরপেট খেয়ে ঘুমুচ্ছে, নইলে কানের ঘায়ের ওপর এক ঝাঁক মাছি ভনভন করছে, তাতেও সাড় নেই ছেলেটার! ঘায়ের মাছি তাড়াতে তাড়াতে কালীনাথ হাঁক পাড়ে।

'অ লাল্টুর মা, শুনচিস! শোনসে—জবর খপর।'

ভামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তার মুখের দিকে তাকিয়েই চমকায় কালীনাথ।

'তুই খাসনি?'

'হুঁ খেইচি! তা'পর, তোমার জবর খপরটা কি শুনি?'

জবর খবর বলার সব উৎসাহ মুহূর্তে উবে যায়। সাধারণ সুরে গড়গড় করে কালীনাথ বলে, 'না না তেমন আর কি! বলবখন, পরে বলবখন। আয়, আগে খেয়েনি।'

'না, তোমার জবর খপরটাই শুনি পেরথম।'

কালীনাথ ইতস্তত করে, ভামিনী নাছোড়।

'কি, কইতে লজ্জা হয়?'

'লজ্জা! কোন্ শালাকে লজ্জা?' এক দমকে শহরে যাওয়ার কথাটা বলে ফেলে কালীনাথ হেঁসেলে গিয়ে ঢোকে।— 'আয় খেয়েনি। এখন আর নাইতে মন চাইছে না। নাইবখন সাঁঝবেলায়, অ্যা? ওকি, দাঁইড়ে রইলি যে, আ-য়।'

আস্তে আস্তে ভামিনী এসে হেঁসেলে ঢোকে।

বাপের আমলের থালা বাটি উধাও হয়েছে প্রথম ধাক্কাতেই। মাটির হাঁড়িতে ভাত, মাটির গামলায় ডাল, মানপাতায় আলু-চচ্চড়ি। একটা ধোয়া মানপাতা এগিয়ে দিয়ে ভামিনী ভাত বাড়তে শুরু করল।

'ইকি তোর? তোর পাতা?—জবাব দিস না কেন?'

'পরে খাব।'

'না, এক সাথে। আয় তবে এক পাতায় দোজনে—

'না।'

'না? ধ্যেৎ! দাঁড়া, তা'লে আরেকটা পাতা কেটে নিয়াসি?'

'না বলছি।'

ভামিনীর গলা শুনে কালীনাথ চমকে গেল। ব্যাপার কি? তখন থেকে হল কি বউটার? বারবার তাকে এমন করে

ও চমকে দেয় কেন? অঁ্যা? চচ্চড়ির আলু দাঁতে কামড়ে ফ্যাল ফ্যাল করে সে ভামিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'তুই নাসনি?'

ভামিনী ঘাড় নাড়ে।

'অ, তাই বল। নাসনি বলে খাবিনি? তাই বল—কিন্তুক কেন নাসনি? নেয়ে নিলেই পারতিস—'

উপোসী বউটাকে ফেলে খেতে কালীনাথের মনটা বড় খিঁচ খিঁচ করছিল, এখন একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেয়ে সব দ্বিধা তার ঘুচে যায়। সত্যিই তো, ব্যাটাছেলে না নেয়ে খেতে পারে, কিন্তু মেয়েছেলেও তা পারে নাকি? ঠিক ঠিক। সামনে বাড়া ভাত দেখে খিদের জ্বালায় মাথাটাই আসলে গুলিয়ে গেছে কালীনাথের। নইলে এমন ভুল তার হয়? কবে না নেয়ে খেয়েছে ভামিনী যে আজ খাবে?

ডাল ঢালতে তর সয় না, গপাগপ কয়েক গ্রাস মুখে দিয়ে বিষম খায় কালীনাথ।

অবিশ্যি ভামিনীর উচিত ছিল এর মধ্যে নেয়ে নেয়া। তাহলে কিন্তু বেশ হত, কেমন এক সাথে খেত দুজনে। একপাতেই খেত, পাশে বসিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে দিত ভামিনীকে—নতুন বিয়ের পর লুকিয়ে লুকিয়ে যেমন দিত মাঝে মাঝে। ব্যাপারটা হয়েছে কি, তার দেরী দেখে খিদের চোটে চটে গেছে কিনা বউটা, তা-ই এত অভিমান। মেয়েছেলে হলে কি হবে, খিদে-তেষ্টা তো ওদেরও আছে! একটু দম নিয়ে কালীনাথ ফের অনুযোগ জানায়, 'মাইরী, তুই যেন ক্যামন ধারা মানুষ! এতক্ষণে একটা

ডুব দিয়ে এসতে পারলি নি—এক সাথে কেমন খেতুন তাহলে !'
'ডাল দেব ?'
'দিবি, দে। ওকি ওকি—'
বোধ হয় ভামিনীর হাতটা একটু কেঁপে গিয়েছিল, গামলার সবটুকু ডাল পাতে গড়িয়ে পড়ল।
কালীনাথ হাত গুটিয়ে বসে।—'ছাখত কি কাণ্ড করলি! তুই এখন খাবি কি দিয়ে !'
'সে হবে খন—তুমি খাও।'
'ধ্যেৎ, সে কি হয়। এই চচ্চড়িটুকুন রইল, তুই খাস।' চচ্চড়ি-টুকু পাতের কিনারে সরিয়ে রাখে কালীনাথ, 'এমন হুড়ুম-দাড়ুম করিস—একি ইয়ে পেইচিস ?' অশ্লীল একটা দাম্পত্য রসিকতা করে সে হেসে ফেলে।
ভামিনী নির্বিকার।
'ভাত আরও আছে। লাগলে চেও কিন্তুক—'
'আলবৎ চাইব। এক সের চাল বাব্‌বা—হুঁ হুঁ। কাল থেকে তো পাকা ব্যবস্থা।'
চেয়ে চেয়ে ভাত নেয় কালীনাথ। চিবনোর তর সয় না, গোগ্রাসে গিলে চলে।

দমসম লাগছে। টান হয়ে বসে শ্বাস টানে। ঢেঁকুর তোলে, পেটে হাত বুলোয়।
'দেব আর দুটি ?'
'মাথা খারাপ! পেট ফেটে যাবে তা'লে।'

'বেশ। দুটি ভাত কিন্তুক রইল, ওব্‌লা খেও।'

'মানে? তুই? তুই খাবিনি?'

ভামিনী কথা বলে না। হঠাৎ পিছন ফিরে হাঁড়ি-কুড়ি ঠিক করতে থাকে।

'তুই কি আগে খেয়ে নিইচিস বউ?'

'থু থু ঘেন্না! ও ভাত আমি মুখে তুলব—থু থু!' এক ঝটকায় ভামিনী ঘুরে বসে। রুক্ষ একমাথা চুল, ভাঙা গালের মধ্যে ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে কোটরাগত দুই চোখ। থর থর করছে ঠোঁট, সারা শরীর।

'বলিস কি তুই?'

'কিছু না—পেট ভরেছে, এবার ওঠ—যাও।'

'আর তুই? তুই খাবিনি?'

'আমি খাব? পাছাল মশায়ের টাকায় কেনা চালের ভাতে আমি—'

'কি? কি বললি?' গর্জন করে উঠল কালীনাথ।

'কি বললি?' ফেটে পড়ল ভামিনী, সে-ও সমানে রুখে ওঠে, 'লজ্জা করে না, লজ্জা করে না তোমার মুখ নেড়ে কথা কইতে? নিজের ভাইকে যে পুলিশে ধরিয়ে দিল, ভাই—'

'ভামি, ভামি—!'

—'বৌকে যে পুলিশ দিয়ে বেইজ্জত করাল, পেরথম পোয়াতির ছেলে যে নষ্ট করাল, জেলের মধ্যে যার তরে ভাইটা গুলি খেয়ে মরল, সারা গাঁয়ের লোককে যে না খাইয়ে মারছে, সেই শকুনের—

'থাম থাম ভামি,' মর্মান্তিক আর্তনাদে কঁকিয়ে উঠল কালীনাথ, 'তোর পায়ে পড়ি বউ, থাম থাম—'

'না না না। কেন,—কেন আমি থামব! তুমি কি মানুষ? জানোয়ার —তুমি জানোয়ার, নইলে ওই খুনের টাকা হাত পেতে নিয়ে—'

'আঃ! থামলি, থামলি হারামজাদী—'

'থামব! কেন? কার ভয়ে? নিজের ভাইয়ের কথা, ভাইবৌয়ের কথা মনে করে দেখ, দেখ মনে করে—আর ওর দেয়া টাকায়—'

'থামলি থামলি থামলি হারামজাদী—থামলি'—তড়াক করে উঠে দাঁড়াল কালীনাথ। শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে ভামিনী যেন আষ্টেপৃষ্টে চাবকাচ্ছে তাকে। তার গোপন ক্ষতটাকে যেন ধারালো নখ দিয়ে এক নাগাড়ে খুঁচিয়ে চলেছে। শুনতে চায় না, কিছু শুনতে চায় না—কালা হয়ে যেতে চায়, মরে যেতে চায়, পৃথিবী থেকে মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে চায় কালীনাথ।

ভরা পেটেও চোখে তার আঁধার ঘনিয়ে আসে, পায়ের তলায় পৃথিবী দুলে ওঠে।

বার বার একই প্রশ্নের জবাব না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারান সত্য দারোগা, লাথি কষান। লাথির পর লাথি। গর্জে ওঠেন—

'বল বাঞ্চোৎ বল, ভালো চাস তো এখনো জবাব দে কথার!'

জামরুল তলায় ভিড় জমেছে, আগের চেয়েও বেশী লোকের ভিড়। কিন্তু দারোগাকে এবার বার বার লাথি মারতে দেখেও কোন রকম উত্তেজনা নেই ভিড়ের মধ্যে। খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালে হয়ত দেখা যাবে, প্রত্যেকটি লাথির সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠছে মানুষগুলি, ছলছল করছে চোখ, চাপা নিশ্বাস ছাড়ছে সকলে।

আগের মতই থানার কম্পাউণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছে লালু, বারান্দার কিনার ঘেঁষে, দালুকে কোলে নিয়ে। ঘুমঘুম চোখে অবাক দু'ভাই বাপের দিকে তাকিয়ে আছে, দম বন্ধ করে।

বিনয় দত্তর ডিউটি নেই এখন। ব্যারাকে নিজের চারপয়ের ওপর সে উবু হয়ে মুখ গুঁজরে পড়ে আছে। ফোঁপাচ্ছে।

কার্বন ঠিক করে পেন্সিল বাগিয়ে ডায়েরী টেনে নিয়ে বসেছে চিত্ত মুখুজ্জে।

সত্য দারোগা থামলে পাঁড়ে রুলের গুতো মারে, 'বোল্ সালে, বোল,—মু'সে বাত্ নিকাল্।'

'দেখছেন স্যার, দেখুন, আপনিই দেখুন—এত করেও একটা কথা যদি বার করা যায়।'

চায়ের কাপটি শেষ করে বিজ্ঞ হেসে পাছাল মশায় বললেন, 'ও ব্যাটার গুষ্টিই ওই রকম, চিরকাল দেখে আসছি—'

'কিরে, কথা বলবি কি বলবি না?' টেবিলের ওপর সশব্দে ঘুঁষি মারে চিত্ত মুখুজ্জে, 'এরপর আমি যদি উঠি তাহলে কিন্তু হাড় কখানা আর আস্ত থাকবে না। এ শর্মাকে তুমি এখনো চেননি শালা—'

শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কালীনাথ, আছে তো আছেই।

'কথার জবাব দে চট্পট, নইলে সাঁড়াশি দিয়ে কিন্তু জিব টেনে বের করব।'

কিন্তু কি জবাব দেবে কালীনাথ? কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল নিজেই কি তার কিছু বুঝতে পারছে—দুটি ঘণ্টা একনাগাড়ে ভেবে ভেবেও, এত মারধোর খেয়েও? মাথার মধ্যে যেন গুটিচারেক কাঁকড়া

বিছে কামড়াচ্ছে, এক গাদা ছিনেজোঁক চেপে ধরেছে কণ্ঠনালী।
'তবে রে—'চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল চিত্ত মুখুজ্জে, পাছাল মশায় বাধা দিলেন।
'থাক থাক, অত হ্যাঙ্গামার কি দরকার। এমনিই একটা ডায়েরী করে রাখুন না।'
'বললেন তো, কিন্তু কিসের ডায়েরী করব বলুন?'
'কেন, স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ!' একটু থেমে মিষ্টি মিষ্টি হাসতে হাসতে পাছাল মশায় বললেন, 'দুশ্চরিত্রা স্ত্রী—তার সাক্ষী পাওয়া যাবে, সে পাইয়ে দেব'খন—লিখে রাখুন, স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া পদাঘাতে তাহাকে হত্যা। স্ত্রী-শাসনের ডায়েরী একটা সকলের আছে না? তবে আর কি—'
ফ্যালফ্যাল করে তাকায় কালীনাথ। দুশ্চরিত্রা স্ত্রী! স্বভাব-চরিত্র খারাপ ছিল তার বউয়ের, তার ভামিনীর, তার ভামির, তার লালু-দালুর মা'র? বলে কি শূওরের বাচ্চা?
উঠে দাঁড়িয়ে সেই রকম আরেকটা লাথি কষাবে নাকি পাছালের মুখে? এক লাথিতে দেবে নাকি থেঁতলে ওই খানকির ছেলের ভরন্ত মুখটা?

কিন্তু, অসহায় কালীনাথ, বড় অসহায়! হাত-পা যে দড়ি দিয়ে বাঁধা তার, পাশে যে রাইফেলের পাহারা তার!